দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।। ২৯ ভাদ্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৫ সেপ্টেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

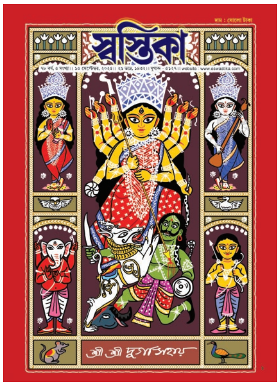

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

প্রাতিষ্ঠানিক ভিক্ষায় 'এক লাফে এক লাখ' মানুষের টাকা খাচ্ছে কাক! ক্লাব খয়রাতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর ভোট ভিক্ষা
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

পূজা কমিটিও দুধেল গাই! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

'উৎসবের'-এর পরিবর্তে পূজায় অংশগ্রহণ করুক বাঙ্গালি
◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বঙ্গের বাইরেও মহাসমারোহে বাঙ্গালির দুর্গাপূজা
◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১১

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গা আরাধনা এবং বাঙ্গালির উত্তরাধিকার
◻ অরিত্র ঘোষ দস্তিদার ◻ ১৪

দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্রস্থল
◻ রবিব্রত ঘোষ ◻ ১৬

তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে আঢ্যিবাড়ির ঐতিহ্যপূর্ণ 'শিবদুর্গা'পূজা
◻ সপ্তর্ষি ঘোষ ◻ ১৮

বাংলা সাহিত্যের প্রথম শারদীয়া ও বাংলা শারদীয়া সংখ্যার প্রথম বিজ্ঞাপন ◻ সংকর্ষণ মাইতি ◻ ১৯

দুর্গাপুরের গড়জঙ্গলে মেধস মুনির আশ্রম
◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বুড়িমার পূজা ◻ গীতশ্রী চক্রবর্তী ◻ ৩৪

চিত্তরঞ্জন পার্কের দুর্গাপূজা বাঙ্গালিয়ানায় ভরপুর
◻ অত্রি মল্লিক ◻ ৩৫

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ◻ সর্বাণী চক্রবর্তী ◻ ৩৭

মা আসছেন ◻ বৈশাখী কুণ্ডু ◻ ৩৯

প্রত্যেক হিন্দুর করণীয় বিধি পিতৃপক্ষে পিতৃতর্পণ
◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৪৩

বাঁকুড়া শহরে গোপীনাথপুর দত্ত বাড়ির প্রাচীন দুর্গাপূজা
◻ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৪

সোনামুখী পালবাড়ির দুর্গাপূজা ◻ বিজয় ঘোষাল ◻ ৪৫

'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'
◻ বিমল কৃষ্ণ দাস ◻ ৪৬

মহামায়া : অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান ◻ লক্ষ্মণ চন্দ্র মাইতি ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

ফ : ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত হবে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পূজা সংখ্যা। থাকছে উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটো-বড়ো বিভিন্ন স্বাদের গল্প।

মূল্য একই আছে— সত্তর টাকা

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালির মহাপূজা

বাঙ্গালির মহাপূজা সমাগত। আর এক পক্ষকাল বিলম্ব রহিয়াছে। আয়োজনের ব্যস্ততাও তুঙ্গে। গ্রাম-শহরের বারোয়ারি ও পারিবারিক পূজামণ্ডপে প্রতিমা শুধু রঙের প্রলেপের অপেক্ষায়। প্যান্ডেল বাঁধিবার কাজও প্রায় সমাপ্তির মুখে। আপামর মানুষের মনেও যে আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে তাহা স্পষ্ট। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যে শ্রমজীবী মানুষের দল পাড়ায় পাড়ায় নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহাদের মুখমণ্ডলের চিত্র তাহারই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। একেবারে অজ পাড়াগ্রাম হইতে কলকাতার কুমারটুলির মৃৎশিল্পীদের মুখমণ্ডলেও আনন্দের আভাস। এই সময়েই তাহাদের ঘরে আসিবে সংবৎসরের সম্বল। বাঙ্গালির মহাপূজা যে রাষ্ট্রপ্রতিমার পূজা! রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি অঙ্গের মানুষের যে তাহাতে সহভাগিতা। বিশ্বের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করিয়াছেন বাঙ্গালির দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া কী বিশাল অর্থের লেন-দেন হইয়া থাকে, যাহাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকেন। ভারতাত্মার সন্ধান না পাওয়া কমিউনিস্টরা বহু বৎসর প্রচার করিয়াছে দুর্গাপূজা বন্ধ করিবার। তাহাদের মতে ইহাতে নাকি শুধুমাত্র অর্থের অপচয় হইয়া থাকে। বহু প্রচার করিয়া এবং তিনদশকের অধিক রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহারা বাঙ্গালির মন হইতে বিন্দুমাত্র ধর্মভাব বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, বরং তাহারাই শুধু ভারত নহে, বিশ্বমঞ্চ হইতেও বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বহু পূর্বেই বলিয়াছেন, ধর্মে হস্তক্ষেপ করিলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আশ্চর্যের বিষয় যে, ভণ্ড কমিউনিস্টরা যত উৎসাহের সহিত দুর্গাপূজার বিরোধিতা করিয়া থাকে, তত উৎসাহেই তাহারা দুর্গাপূজার মণ্ডপে মণ্ডপে কমিউনিস্ট সাহিত্যের স্টল খুলিয়া বসে। তাহারা দীর্ঘকাল বাঙ্গালিকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালি তাহাদের স্তোকবাক্যে বিভ্রান্ত হয় নাই। দুর্গাপূজা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে আর তাহারা নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। আসলে মা দুর্গা তো বাঙ্গালির ঘরের কন্যা। কন্যাকে তাহারা পিতৃ-মাতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে কী করিয়া! পূজার চারি দিবস তিনি সপরিবারে পিতৃগৃহে আসেন। তিনি যে জগজ্জননী, তাই প্রকৃতিদেবীও তাঁহাকে বরণের ডালি সাজাইয়া তৈরি থাকেন। বঙ্গের কবি, সাহিত্যিকগণ সেই আয়োজনের বর্ণনা তাঁহাদের গানে-কবিতায়-সাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

বাঙ্গালির এই মহাপূজা আজ শুধু বঙ্গভূমিতেই সীমাবদ্ধ নহে। যেখানে বাঙ্গালি, সেখানেই তাহারা মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বঙ্গভূমির বাহিরে যেখানে বাঙ্গালি রহিয়াছেন, পূজার কয়েকটি দিন তাহাও ক্ষুদ্র বঙ্গভূমিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তাহা বিহার প্রদেশের পাটনা অথবা দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক, মুম্বাইয়ের শিবাজী পার্ক কিংবা বারাণসীর বাঙ্গালি গলি হউক না কেন। ওড়িশা-সহ দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যেও বাঙ্গালিরা মহাপূজায় মাতিয়া থাকেন। এই কথা বলিবার অবকাশ নাই যে, দুর্গাপূজার আজ বিশ্বায়ন ঘটিয়াছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাহিরেও মহাধুমধাম সহকারে দুর্গাপূজা পালিত হইতেছে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর তো বটেই, এককালের কমিউনিস্ট দেশ রাশিয়া এবং বর্তমান কমিউনিস্ট দেশ চীনেও বেশ উৎসাহ সহকারে দুর্গাপূজা আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের সহিত সেই দেশের অধিবাসীরাও সমান উৎসাহে, সমান ভক্তি-শ্রদ্ধায় পূজায় অংশগ্রহণ করিতেছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাগুলিও ভিন রাজ্যে বা বিদেশে দুর্গাপূজায় বড়ো ভূমিকা পালন করিতেছে। গর্বের বিষয় যে, ইউনেস্কো ২০২১ সাল হইতে দুর্গাপূজাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও দুর্গাপূজার উপর বিঘ্ন ঘটানো হইতেছে। প্রতিবেশী দেশ একদা এই বঙ্গভূমিরই অঙ্গ বাংলাদেশে নিয়ম করিয়া প্রতি বৎসর দুর্গাপূজায় আক্রমণ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গও ইহার ব্যতিক্রম নহে। এই রাজ্যেও বিশেষ একটি শ্রেণীকে খুশি করিবার জন্য শাসকদলের বা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ হইতে পূজার অনুমতি অথবা ঠিক সময়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের অনুমতি পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কোথাও কোথাও বিধর্মীদের আক্রমণে পূজায় বিঘ্নও ঘটিতেছে। তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গালি বিশ্বাস করে, জগজ্জননীর কৃপায় একদিন নিশ্চয় এই অসুরকুলের পরাজয় ঘটিয়া এই দুর্দিন ও ভয়াবহ মানসিকতার অবসান হইবে— এই অভয়বাণী মা স্বয়ং শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দান করিয়াছেন।

সুভাষিতম্

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।। (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫৪।৫৫)

অর্থ ঃ এই প্রকার যখন যখন পৃথিবীতে দানবদের দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখন তখন আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুদের সংহার করব।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিক্ষায় 'এক লাফে এক লাখ' মানুষের টাকা খাচ্ছে কাক!

ক্লাব খয়রাতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর ভোট ভিক্ষা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ক্ষমতায় আসার পাঁচ বছরের ভিতরেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে গিয়েছিলেন যে, ভাত না ছড়ালে কাক আসবে না। নীতি, আদর্শ ও সততাকে চুল্লিতে পাঠিয়ে সাত বছর আগে দুর্গাপূজায় ভিক্ষা ছড়ানোর কাজটা তিনি শুরু করেছিলেন। চালু হয় 'পূজায় দক্ষিণা' দেওয়ার আড়ালে যথেচ্ছ ক্লাব খয়রাতি। ২০১৮ সালে রাজ্যের ২৮,০০০ পূজা কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। সেই শুরু। সেদিন তাঁর ঘোষিত ১০ হাজার টাকার দক্ষিণা এখন ১ লক্ষ ১০ হাজারে পৌঁছেছে। এক বশংবদ শিল্পপতির বদান্যতায় বিদ্যুতের বিলে আশি শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা উৎসব ফান্ড উৎকোচে মকুব হয়েছে। সবরকম দক্ষিণা ও ছাড় বাবদ রাজ্যের খরচ আনুমানিক ৪৮০ কোটি টাকা। মহামারীও এই উৎকোচ দানের প্রবাহ থামাতে পারেনি। এটা ভোট কেনার দীর্ঘমেয়াদি ঘুষ। নাহলে কেবল ভোট বছরেই তা দেওয়া হতো। প্রতি বছর প্রায় ৪৪ হাজার বারোয়ারি দুর্গাপূজা কমিটির ভিতর মাত্র তিনটি কমিটি এই অনুদানের অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ তৃণমূল-বিরোধী বিজেপির ভোট এই রাজ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ। কলকাতার দুর্গাপূজা বিশ্বের দরবারে ঠাঁই পেয়েছে আর কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষায় মর্যাদা দিয়েছে। এই দুই সম্মানের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। অথচ দু'টি বিষয় নিয়েই ভরপুর রাজনীতি করেন তিনি। কিছু মানুষের মাতব্বরি করা স্বভাব। কয়লা বহুবার ধুলেও তার ময়লা যায় না।

সিপিএম ছিল ধর্মবিরোধী। বিদেশি ভাবনায় পরিচালিত দল। সাম্রাজ্যবাদী সাহেব শাসকদের চোখে হিন্দু দেব-দেবীর ভাবনার থেকে সিপিএমের ভাবনা খুব একটা পৃথক নয়। তাই ক্ষমতায় থাকার জন্য সিপিএমের অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে যায়। ২০১৬ সালের ভোটের পর তৃণমূলনেত্রী বুঝেছিলেন যে, এ রাজ্যে একটা বড়ো অংশের মানুষকে চৌত্রিশ বছরে সিপিএম ভিখারি করে রেখেছে। ভূমি সংস্কারের ধামা বাজিয়ে তাদের দলদাসে পরিণত করেছে সিপিএম। ধ্বংস হওয়ার আগে সিপিএম রাজ্যের ঘাড়ে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার দেনা রেখে যায়। এই ১৫ বছরে সেই উচ্ছিষ্টের বোঝা প্রায় ৭ লক্ষ কোটিতে পৌঁছে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬-এর পর তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে রাজ্যটাই হয়তো ভিখারিতে পরিণত হবে। অনেকে সে দাবি করছেন। সিপিএমের ধর্মবিরোধিতার বিরুদ্ধে তৃণমূলনেত্রীর কোনো আন্দোলন নেই। অথচ ৩৪ বছরে তার শরীরে বহু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সেই সঙ্গে জুটেছে তার নাটুকেপনা। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া উৎকোচের বিষয়টি অনেকেই মাথায় রাখেন, তাই এইসব সামাজিক প্রকল্পের মুখোশে রেউড়ি রাজনীতি করেন তৃণমূলনেত্রী। অবশ্য দেশের কোনো সিউডো-সেকুলার, পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তাতে পিছিয়ে নেই। তবে তুল্যমূল্য বিচারে তৃণমূলনেত্রী প্রথম। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সরকারি খাতে সংগ্রহ করা জনগণের টাকা কীভাবে এবং কেন কোনো পূজা-পার্বণ বা উৎসবে ব্যবহৃত হয়, তা যদিও বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে সুপ্রিম আদালত কোনো নির্দেশ জারি করেনি। কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়। সরকারি সার্কুলারের ওপর হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ স্থগিতাদেশ দিলেও সেই নির্দেশ খারিজের জন্য ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। এই মামলার পরিণতি যদিও জানা যায়নি।

> **২০২৪-এর আগস্ট মাসে অভয়া কাণ্ডের মতো নারকীয় ঘটনার পরেও এ রাজ্যের বেশিরভাগ দুর্গাপূজা কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর ছড়ানো 'ভাত' খেয়েছে। সে লজ্জা বাঙ্গালি আর কতদিন লুকিয়ে রাখবে?**

এ রাজ্যের একটি শিশুও জানে পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে সরকারি অর্থের অপব্যয় হয়। করদাতাদের টাকার যথেচ্ছ ব্যবহার বা অপচয়ের আড়ালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার যে রাজনৈতিক ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়, তার থেকে অব্যাহতি পেতে এই সমস্ত সহজ উপায় বের করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই হিন্দুধর্মের নিন্দা করে, শ্রীজগন্নাথ ও মা দুর্গাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবে ভেসে থাকতে সচেষ্ট হন। তৃণমূলনেত্রী বিশ্বাস করেন যে, আদর্শ বা নীতির জোরে ভোট ভিক্ষা পাওয়া যায় না বা ভোটে জেতা যায় না। তাই বামফ্রন্ট জমানার ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টকে পরমান্ন হিসেবে বিতরণ করে তাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। বন্ধু বামেরা তাকে 'খেলা মেলা'র মুখ্যমন্ত্রী বলে ডাকেন। কথাটা আংশিক সত্য বটে। বাকি সত্যিটা হলো রাজ্যে বামেরা ক্ষয়িষ্ণু হলেও তাদের বর্তমান রাজনৈতিক শক্তি তৃণমূলনেত্রীকে হারানোর কাজে ব্যবহৃত হয় না। তাকে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার খেলায় বামেরাও শামিল। তৃণমূল-বিরোধী ভোট কেটে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই জেতায়। রাজ্যে বিজেপির উত্থান রুখতে তৃণমূলনেত্রীই হলেন তাদের শেষ পারানির কড়ি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে 'ভাত' ছড়িয়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করেন, আজ পর্যন্ত সিপিএম দল তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট বিরোধিতার কোনো চিহ্ন রাখেনি। এই রাজ্যে একটা ধারণা রয়েছে যে, 'ভাত' ছড়ানোর রাজনীতি বন্ধ করা যায় না। তাই কোনো জোরদার প্রতিবাদ না থাকার সুযোগ নিয়েই রাজ্যের মানুষের নজর ঘুরিয়ে রাখছেন তৃণমূলনেত্রী। ২০২৪-এর আগস্ট মাসে অভয়া কাণ্ডের মতো নারকীয় ঘটনার পরেও এ রাজ্যের বেশিরভাগ দুর্গাপূজা কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর ছড়ানো 'ভাত' খেয়েছে। সে লজ্জা বাঙ্গালি আর কতদিন লুকিয়ে রাখবে?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পূজা কমিটিও দুধেল গাই!

ভোটক্রেতাষু দিদি,

আপনার থেকে ভোট কী করে কেনা যায় তা শিখতে হবে। এই যে দুর্গাপূজা আসছে, সেটাকেও আপনি ধাপে ধাপে ভোট কেনার মেশিন বানিয়ে ফেলেছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজা আসা মানেই পাপও আসছে। এই কথাটা শুনে অবাক লাগছে? লাগবে না দিদি। বাঙ্গালির চরিত্র নষ্ট করে দিতে কীভাবে আপনার সরকার দুর্গাপূজাকে কাজে লাগিয়েছে তা আমি স্পষ্ট করে দিতেই এই চিঠি লিখছি। এত কিছু রয়েছে এর মধ্যে যে আমাকে অন্যদিনের তুলনায় একটু বড়ো চিঠিই লিখতে হবে। কষ্ট করে পড়ে নেবেন প্লিজ।

এ বার দুর্গাপূজার ক্লাবগুলিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আপনার ঘোষণার দিন আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল, আমার প্রয়াত পিতা কেন আমার জন্য পর্যাপ্ত টাকা রেখে গেলেন না। সত্যি বলছি দিদি, আমি ভোগ করতাম না। আপনার মতো করে দরিদ্র মানুষদের বলতাম, বলুন কতো চাই? হাজার হাজার টাকা এইভাবে বিলিয়ে দিতাম। না দিদি, আপনি একদমই এটা ভাববেন না যে, আমি আপনাকে 'বাবার টাকা' কিনা সেই প্রশ্ন তুলছি। আমি শুধু এটাই বলতে চাইছি যে, পৈতৃক সম্পত্তি না থাকলে কি এমন উদার হস্তে এবং উদার কণ্ঠে দানধ্যান করা যায় বলুন! তবে যেভাবে পূজার সঙ্গে দুর্নীতি এবং পাপের মিশেল ঘটানো হয়েছে আপনার আমলে তার জুড়ি মেলা ভার!

আপনার দেওয়া টাকা নিয়ে একটা বড়ো মুশকিল কী জানেন? ওই টাকা আদৌ পূজায় খরচ করা যায় না। প্রতিমা কেনা দূরে থাক, সিদ্ধি-সিঁদুর কেনার দশকর্মার ফর্দকেও ওই অর্থ খরচের হিসাবে দেখানো যায় না। নিয়ম অনুযায়ী, পুরোহিতকে দেওয়া দক্ষিণা বা ঢাকির খরচও সরকারি অনুদানের অর্থে করা যায় না। পুরোটাই পাপের টাকা যে। সরকারি অর্থ হলো রাজ্যের করদাতা বা জনগণের টাকা। সেই টাকা অপচয় করা অপরাধ নয়, পাপ।

সংক্ষেপে, এই অনুদানের ইতিহাসটা একবার মনে করাই আপনাকে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরের বছর আপনি গোটা রাজ্যের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু ক্লাবকে পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছিলেন। বাছাই করা ক্লাবগুলি প্রথম বছরে এককালীন ২ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী ৩ বছর ১ লক্ষ করে মোট ৫ লক্ষ টাকা পেত। যদিও কোভিড পর্বে ২০২০ সাল থেকে ওই প্রকল্পে অর্থ দেওয়ার কাজ স্থগিত রাখা হয়। ২০২৩ সালে তা পুরোপুরি বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে।

তার আগেই দিদি আপনি, রাজ্যের পূজা উদ্যোক্তাদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া শুরু করেছিলেন ২০১৮ সালে। তখনই পূজা বাবদে বিদ্যুতের বিলে ২৫ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা এবং ২০২১ সালে এক লাফে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৬০ হাজার এবং ২০২৩ সালে ৭০ হাজার টাকা করা হয়। পরের বার মানে ২০২৪ সালে এই অনুদান বেড়ে হয়েছে ৮৫ হাজার টাকা। তার পরে এ বার একেবারে লাখ টপকে গিয়েছে। এক লাখ দশ হাজার। শুনলাম আপনার ঘোষণার পর অর্থ দপ্তর জানতে পেরেছে যে, এই বাবদ ৪৭৩ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। গত বারের থেকে ১০০ কোটি বেশি। দিদি এটাও মনে রাখতে হবে যে, শুরুতে ক্লাব ছিল ২৮ হাজারের মতো। এখন বেড়ে সেটা ৪৩ হাজারের বেশি। কীভাবে এই টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে সেটাও বলব নাকি দিদি?

বলেই দিই। পূজা কমিটিদের বিদ্যুৎ বিলে ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার জন্য সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন পর্ষদকে বলেছেন আপনি। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ না হয় লোকসান মেনে নেবে। কারণ, এই রাজ্যে আপনার মর্জি ইজ ইকোয়াল টু রাজ্য সরকারের নীতি। কিন্তু বেসরকারি সিইএসসি কেন লোকসান মানবে বলুন তো? হয় তারা অন্যভাবে সুবিধা নেবে কিংবা সাধারণ গ্রাহকের বিল বাড়িয়ে দেবে।

এই অনুদান নিয়ে একাধিক মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। প্রথমবার, ২০১৮ সালে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই সময়ে, রাজ্যের পক্ষে আদালতে জানানো হয়েছিল, দুর্গাপূজা উদ্যোক্তাদের এই টাকা দেওয়া হচ্ছে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্পের প্রচারের জন্য। কেউ বুঝতে পারেনি সেই দাবির কথা। আসলে এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার নিশ্চিত করে দেয় যে, প্রতিটি মণ্ডপে আপনার ছবি থাকবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা পুলিশের ওই বিজ্ঞাপনে বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ। ঠাকুর দেখার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-দর্শন ফ্রি। আপনার বুদ্ধির তুলনা হয় না। আমার যে একটা দিদি আছেন, সেটা ভেবে না আমার কেমন একটা গর্ব হয়। ঠিক গর্ব নয়, অহংকার বলতে পারেন।

কিন্তু আপনি এটাকে দুর্গাপূজার টাকা বললেও পূজায় কি তা খরচ করা যায় না? একটি মামলার প্রেক্ষিতে ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট কিছু শর্তও বেঁধে দেয় রাজ্যকে। শর্তে বলা হয়েছিল, অনুদানের অর্থব্যয় সংক্রান্ত নথি হাইকোর্টে জমা দিতে হবে। তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। কিন্তু সেই নথিপত্র দেওয়া হয়েছিল কি?

নিয়ম অনুযায়ী এখন পুলিশের 'আসান' অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করতে হয় এই টাকা পাওয়ার জন্য। গোটা রাজ্যে যত দুর্গাপূজা রয়েছে, তাদের স্থানীয় থানায় হিসাব জমা দিতে হয় পূজার পরে। কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও বছরের পর বছর সেই টাকা খরচের যথাযথ হিসাব জমা পড়ে না। অডিট ছাড়াই টাকা দেওয়া হয়। ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখে সিএজি রিপোর্ট দিক বলে আদালত নির্দেশ দিলেও তা মানা হয় না। হিসাবপত্র প্রতিবারই থেকে যায় অন্ধকারে। অভিযোগ, পূজার পরে মামলাও চলে যায় ঠাণ্ডা ঘরে। এ বারও যথাযথ হিসাব মিলবে তো? আমি বলে রাখি দিদি, হিসাব মিলবে না। কারণটা কিন্তু সেই হিসাব দেওয়ার পদ্ধতিতেই লুকিয়ে রয়েছে। জাল বিল দিয়েই হিসাব দিতে হয়। কোনো অডিট হয় না।

সাধারণভাবে ছোটো পূজার ক্ষেত্রে অনুদানেই মিটে যায় প্রায় সব খরচ। প্রতিমা থেকে মণ্ডপ, প্রসাদ থেকে আলো— সব খরচ হয়ে যায় রাজ্যের অনুদানে। কিন্তু হিসাবে তা দেখালে চলে না। করোনার সময়ে তবু মাস্ক, স্যানিটাইজারের খরচ দেখানো গিয়েছিল। মিথ্যা কম্বল বিলি থেকে আরও নানা কাজকর্মের জাল বিল বানিয়ে জমা দিতে হয়। দিলেই হলো। কেউ পরীক্ষা করে না। পুলিশ এবং আপনার সরকার সবটা বোঝে। খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হয় না। এ টাকার যেন কোনো হিসাবই হয় না। জনসাধারণের করের টাকা তো কী হয়েছে? আপনি বলেছেন, অতএব হবে না। হিসাব টিসাব হবে না। অডিট ফডিটের কোনো প্রশ্ন নেই।

এমনি এমনি নাকি! কেউ জানে কতো বুদ্ধি করে এই টাকা দেওয়ার জন্য রাজ্য বারবার মিথ্যা বলেছে আদালতেও? ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে কলকাতার দুর্গাপূজাকে 'হেরিটেজ' তকমা দেওয়ার কথা তুলে ধরে রাজ্য জানায় যে, এটা শুধু রাজ্য নয়, দেশের জন্যও গর্বের বিষয়। রাজ্য সরকার হলফনামায় জানায়, সংবিধানের ৫১(এ) ধারা অনুযায়ী

'হেরিটেজ' রক্ষার দায়িত্ব দেশের প্রত্যেক নাগরিকের। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকারের কাছে প্রত্যাশা করা হয়, তারা যেন এগুলির সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে। দুর্গাপূজার দিনগুলিতে পূজা ও উৎসব মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য ওই অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু দিদি, আদৌ তো পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজাকে 'হেরিটেজ' তকমা দেয়নি ইউনেস্কো। কলকাতার দুর্গাপূজা পেয়েছে এই স্বীকৃতি। তাহলে গোটা রাজ্যে এত খরচ কেন? ক্লাব মানে ভোট কেনা নাকি! এসব প্রশ্ন কিন্তু আমার নয় দিদি। আমি আপনার একান্ত অনুগত ভাই। আমি তো আপনি যা বলেন সেটা বেদে লেখা রয়েছে বলেই মনে করি।

তবে দিদি, এই টাকা জোগাড় করার পথটা কিন্তু কেমন যেন পাপের। এই রাজ্যে আয় বাড়ানোর একটাই পথ। সেটা হলো, মদ বিক্রি। বাম জমানার শেষ বছর মানে ২০১০-১১ অর্থবর্ষের বাজেটে আবগারি বিভাগ থেকে ১ হাজার ৭৬০ কোটি টাকার মতো। আর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম ন'বছরে, মানে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষেই সেই রোজগারকে রাজ্য সরকার নিয়ে যায় ১১ হাজার কোটিতে।

ওদিকে ২০১৮ সাল থেকে দুর্গাপূজায় অনুদান দেওয়া শুরু হয়। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার আগে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে আবগারিতে রাজ্যের রাজস্ব আদায় হয়েছিল প্রায় ৩,৮৫৭ কোটি টাকা। এরপর প্রতি বছর সেই রাজস্ব কম-বেশি ২১ শতাংশ করে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে পৌঁছেছিল ১৩,৫৪৩ কোটি টাকায়। সর্বশেষ যে বাজেট তাতে রাজ্য সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য হলো সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা। আগে মদ থেকে আয়ে ভাগ বসাত ডিস্ট্রিবিউটররা। এখন সরকারই রাজ্যের একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটর। সরাসরি দোকানদারকে মদ বিক্রি করে। ফলে লাভ বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। 'এগিয়ে বাংলা' স্লোগানটা কিন্তু দারুণ দিদি!

এবার অনেকে প্রশ্ন করবেন, মদ বিক্রির সঙ্গে দুর্গাপূজার কী সম্পর্ক? হে হে বাওয়া! ওখানেই তো দিদির বুদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ উৎসব আবগারি দপ্তরের জন্যও শ্রেষ্ঠ সিজন। আর আমার দিদি মুখ্যমন্ত্রী একটা মস্ত সুবিধা করে দিয়েছেন। আগে পূজা মূলত শুরু হতো মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যা বা মহাসপ্তমীর সকাল থেকে। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যাতেও মণ্ডপ তৈরির কাজ চলত। এখন মহালয়ার আগে থেকেই উদ্বোধন শুরু করে দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, মানে আমার গর্বের দিদি। সেই থেকেই উৎসবের আমেজ শুরু। ওদিকে পূজা একেবারে লক্ষ্মীপূজার আগে গিয়ে কার্নিভ্যাল দিয়ে শেষ। ফলে পূজা এখন কমপক্ষে দশ দিনের। ফলে ফুর্তিও দশ দিনের। রাজ্য সরকারের গোপন স্লোগান— ঢুকু ঢুকু পিও, আর যুগ যুগ জিও। মনে রাখবেন, পূজায় জামাকাপড়ের বাজার খারাপ যেতে পারে, কিন্তু মদের একেবারেই নয়। পূজা লম্বা মানেই মদ বিক্রি বেশি। রাজ্যে প্রায় ৪৫ হাজার পূজা। প্রতিদিন বারোয়ারি পিছু দু'হাজার টাকার মদ বিক্রি হলেই দেখুন না লাভের অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। হিংসা করবেন না। বরং, আমার দিদির বুদ্ধির তারিফ করুন।

একটু অপ্রিয় কথা বলি দিদি! রাগ করবেন না প্লিজ। আপনার দল তৃণমূল ক্ষমতায় এসে না পশ্চিমবঙ্গের সব মানুষকে, বাঙ্গালি জাতিটাকেই ভিখিরি মনে করে। আপনিই গর্ব করে বলেন, জন্ম থেকে মৃত্যু সবেতে আমি ভাতা দিই। কতটা অহংকারের ঘোষণা বলুন তো! 'আমি দিই।' কার পয়সায় দিই? তোমার পয়সায়, তোমারই করের টাকায় তোমায় ভিক্ষা দিই। আর তুমি তা হাত পেতে নাও। লজ্জা নেই তোমার।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা মনে এলো। ভাবুন তো এই ভাণ্ডারে লক্ষ্মীদের প্রতি কোনো সম্মান রয়েছে? এই ভাণ্ডারের সঙ্গেই যুক্ত অলক্ষ্মীর কথা। সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলে বিধবা ভাতা পেতে আবেদন লাগে না। সরকার দেয়, তাই হাত পেতে নেওয়া হয়। স্বামী, সন্তান মদ খেয়ে সরকারের রোজগার বাড়ান। সংসারে অত্যাচার বাড়ান। আর সেই মদ থেকে লাভের টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কতো বড়ো অপমান ভাবুন তো! কতো বড়ো ভিখিরি বানিয়ে দেওয়া।

পিতা বা মাতার মৃত্যু হলে শ্মশানে দাহ করার জন্য সরকার এককালীন দু'হাজার টাকা দেয়। প্রকল্পের নাম— সমব্যথী। কে জানাতে বলেছে এমন সমবেদনা? কাজ দাও না কাজ। এমন কাজ যাতে পিতা, মাতা স্বর্গত হলে তাঁদের দাহকাজটা যাতে নিজের পয়সায় করা যায়। ২০১৬ সালে এই প্রকল্প চালু হয় দিদি। আপনিই বলুন, তার আগে বাঙ্গালির ঘরে কারও মৃত্যু হলে দাহ হতো কী করে? কখনও কি এমন হয়েছে যে, পয়সার অভাবে কারও দাহকাজ আটকে গিয়েছে? প্রতিবেশী, আত্মীয়েরাই তো এগিয়ে এসেছেন চিরকাল। কিন্তু বাঙ্গালিকে ভিখিরি বানাতে হবে তো। দাও না ওকে দু'হাজার টাকা। দিয়ে দাও। তাতে গোটা পরিবারটাকে কিনে নেওয়া যাবে।

দেবী দুর্গাকে কতো আদরে ঘরের মেয়ে মনে করে বলুন তো বাঙ্গালি? এরপরে হয়তো জামাইষষ্ঠীতে বাজার করার টাকাও দেবে আপনার সরকার। হ্যাঁ, উমা তো আমাদের কন্যারূপেও আসেন।

ভাবুন তো কোনো দিন কোনো পাড়ায় টাকার অভাবে দুর্গাপূজা আটতে থেকেছে? বরং, কখনও বন্যা হলে পূজা কমিটি বাকি খরচ কমিয়ে সেবায় মন দিয়েছে। কখনও তাদের হাত পাততে হয়েছে? স্বামীজী, নেতাজীর বাঙ্গালি জাতিকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, এখন সর্বজনীনভাবেও ভিখিরি বানাতে পেরেছে এই সরকার পূজার টাকা দিয়ে।

এতো এতো শ্রী প্রকল্প দিদি, তবু শ্রীহীন এই রাজ্যে আজকের দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকলে তিনি নতুন করে বঙ্গমাতা কবিতাটা লিখতেন। হয়তো এইভাবে শেষ করতেন—

দশ কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ ভিখিরি করে, মানুষ করনি।

'উৎসব'-এর পরিবর্তে পূজায় অংশগ্রহণ করুক বাঙ্গালি

সরকারি অনুদান দিলে দুর্গাপূজা কমিটিগুলির কিছু সুবিধা হয় বটে। কয়েকটি কমিটির ঠাঁটবাটও বৃদ্ধি পেয়েছে গত কয়েক বছরে। কিন্তু এই পূজাগুলিতে কমিটির লোকজন ছাড়া স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব ঠিক কতটা? মায়ের পূজায় তাঁদের কোনো অধিকার রয়েছে? এতকাল ধরে তো যিনি ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন, আর যিনি ৫ টাকা, মা দুর্গা তো তাঁদের দু'জনেরই মা ছিলেন। কিন্তু সরকারি দাক্ষিণ্য আজ পশ্চিমবঙ্গের বারোয়ারি দুর্গাপূজাগুলিকে করে দিয়েছে আরেকটা সরকারি অনুষ্ঠান। বহু মানুষেরই মত যে, এই পূজা আর আমাদের নেই, এটা এখন স্থানীয় নেতার পূজা। নিজেকে স্থানীয় পূজার অংশ হিসেবে ভাবতে না পেরে, পূজার সময়ে মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে অন্যত্র বেড়াতে যাওয়ার লোকজনের সংখ্যা বাড়ছে। এই কারণে দুর্গাপূজার সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বা দক্ষিণ ভারত বেড়াতে যাওয়ার মানুষ প্রতি বছর বাড়ছে লাফিয়ে।

গত কয়েক বছরে দুর্গাপূজায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া লোকজনের সংখ্যা কতো বেড়েছে, সেটা কি আমরা হিসেব করেছি? এর কিন্তু কোনো হিসেব নেই। আগে কারা যেত এবং এখন কারা যায়?

আজ থেকে দেড় দশক আগেও পূজার ছুটিতে একদল লোক বাইরে যেত। তখন কলকাতার বাইরে চাকরি করা বাঙ্গালিরা নিজেদের বাড়ি ফিরত। আর পূজার সময়ে বাড়ি আসার জন্য ছুটি নাকচ হলে মন ভেঙে যেত। এই সময় যারা দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ না করে ভাইজ্যাগ বা অন্যান্য জায়গায় বেড়াতে যেতেন, তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যেত যে, এদের মধ্যে রয়েছেন নাস্তিক, কমিউনিস্ট; আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা কিছু লোকজন, কিছু বিজনেসম্যান, কিংবা সহজে ছুটি না পাওয়া বেসরকারি কোম্পানির লোকজন ইত্যাদি। বিশেষত, দক্ষিণ কলকাতার টিপিকাল কিছু লোকজন হয়ে উঠতেন দুর্গাপূজা চলাকালীন অন্য রাজ্যে পর্যটক।

কিন্তু ইদানীং একটা নতুন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বছর, উত্তরপাড়া বা উত্তর কলকাতার বনেদি ঘটি থেকে দমদম, যাদবপুরের আড্ডাবাজ পূর্ববঙ্গীয় পাড়ার লোকজনও পূজার সময়ে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে; যাঁরা এক দশক আগেও পূজার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করত।

এঁদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় যে এদেরও রয়েছে কিছু অভিযোগ। এদের অভিযোগ যে, পাড়ার দুর্গাপূজায় তাঁদের 'ওনারশিপ'-বোধটাই হারিয়ে গিয়েছে। পাড়ার পূজায় তাঁর বা তাঁদের যে একটি চিরকালীন অধিকার ছিল, সেই ব্যাপারটিই যেন এখন পুরো গায়েব। পূজাগুলি যেন আর তাঁদের নিজস্ব পূজা নয়। পূজাটা ইদানীং ওয়ার্ড কমিশনার বা কাউন্সিলর অথবা বিধায়কের হয়ে গিয়েছে। পূজামণ্ডপে গেলে যখন পাড়ারই একটি বাচ্চা ছেলে হাতজোড় করে বসতে বলছে, তখন যেন মনে হচ্ছে নিজের কাকার ছেলের বিয়েতে নিজেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি। যেন আমি আমার নিজের পাড়ার পূজায় আজ অতিথি। এটা আর আমার বাড়ি নয়,--- 'অতিথিশালা'। যেখানে জন্মালাম, যে মাঠে খেলে বড়ো হলাম, ঘরবাড়ির সব চিন্তা ছেড়ে যে মাঠে বছরের পর বছর দুর্গাপূজায় চারদিন, চার রাত প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছি, সেখানে আজ কেমন নিজেকে 'অতিথি' মনে হচ্ছে। রাস্তায় মা দুর্গার থেকে নেতা-নেত্রীদের হাসিমুখে অভিনন্দনের ছবি বেশি। নেতা-নেত্রীরা যে যুগে 'শারদীয়ার শুভেচ্ছা' জানাতো না, তখনও তো পূজাটা খারাপ কাটেনি? একটা নতুন সংযোজন হয়েছে— পাড়ায় খাওয়া-দাওয়া। পাড়ার পূজায় অংশগ্রহণকারীরা আগে মহাষ্টমীর দিন একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করত। পূজামণ্ডপে একসঙ্গে ভোগ খেতে আসত সকলে। আজ পাড়ার নেতা-নেত্রীরা তিনদিন মাছ, মাংস, বিরিয়ানি ইত্যাদি স্পনসর করছে। সেখানে ঠোঁটকাটা, গালকাটা একজন এসে অহংকারের সঙ্গে বললো— 'আমাদের সরকার অনুদান দিচ্ছে বলেই না এই ব্যবস্থা।'

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর সব হারিয়ে এই দেশে এসে আধপেটা খেয়েও দুর্গাপূজা বন্ধ করেনি দমদম, যাদবপুর, বালুরঘাট বা দিনহাটায় আশ্রয় নেওয়া পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা। সেই দিনও বন্যায় ভেসে যাওয়া ঘাটাল, ময়নাগুড়ি, উদয়নারায়ণপুরের চাষীরা কিন্তু মায়ের পূজা বন্ধ করেনি। সরকারি দাক্ষিণ্য ছাড়াই বঙ্গভূমিতে অব্যাহত থেকেছে শ্রীশ্রী দুর্গার আরাধনা। তাহলে আজ কেন দুর্গাপূজায় এই সরকারি অনুদান? কেন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দিয়ে পাড়ার পূজাগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সাধারণ বাঙ্গালির থেকে? আমাদের মায়ের পূজার নামকরণ কেন কোনো সমাজবিরোধী বা পাড়ার মাস্তানের নামে হবে? কেন মণ্ডলপাড়ার সাবেকি দুর্গাপূজা আজ অমুক দাদার পূজা হিসেবে গণ্য হবে? কেন পূজামণ্ডপে বাজবে চটুল হিন্দি গান? কেন সরকারি অনুদানের নামে সাধারণ মানুষের মায়ের পূজার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে?

রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই জনসাধারণের দেওয়া চাঁদায় গত ৭০-৮০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দুর্গাপূজা হতো। আর আজ নেতা-মন্ত্রীদের আশীর্বাদধন্য, বিগ বাজেটের পূজা করা বড়ো ক্লাবগুলিকে এই অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে সরকারি অর্থের অপব্যয়। ছোটো ক্লাবগুলির সদস্যদের মাদকাসক্ত রাখতে, ভোট করানো-সহ নানা দলীয় কাজ এবং অসামাজিক কাজকর্মের মধ্যে সারা বছর তাদের লিপ্ত রাখতে দুরভিসন্ধিসম্পন্ন একটি রাজ্য সরকার দেদার বর্ষণ করে চলেছে সরকারি অর্থ। বিজয়া দশমীর দিন দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন বন্ধ রেখে দশমীর তিনদিন বা চারদিন পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে অশাস্ত্রীয় কার্নিভ্যাল। পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বা শাসক দলের সব পদক্ষেপই প্রকৃতপক্ষে অধার্মিক। পূজার নামে এরা মোচ্ছবে আগ্রহী। এই কারণেই দিন পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালি। □

বঙ্গের বাইরেও মহাসমারোহে বাঙ্গালির দুর্গাপূজা

দুর্গাপদ ঘোষ

কিছু কিছু কথা আছে যা প্রবাদের মতো। যেমন 'যেখানে বাঙ্গালি থাকবে সেখানেই পূজা।' হিন্দু বাঙ্গালির 'পূজা' মানে শারদীয়া দুর্গাপূজা। পশ্চিমবঙ্গের কথা তো আলাদা করে বলার কিছু নেই। এখানে এই পূজার সংখ্যা অগুনতি। ২০২৪ সালে কেবল নথিভুক্ত বারোয়ারি পূজা হয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার। তার মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ছিল ১৫ হাজারের মতো। সারা বিশ্বে মোট ২০৬টা দেশ আছে। তার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটা দেশের কথা বাদ দিলে দুর্গাপূজা নিয়ে হিন্দু বাঙ্গালির আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না এমন কোনো দেশ নেই। আমেরিকা থেকে জাপান, আলাস্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া, যেখানেই বাঙ্গালি সেখানেই দুর্গাপূজা।

প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী ইদানীংকালে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন। তারপর কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে এই পূজা জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। কিন্তু ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে থাকা ইউনেস্কোর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ৯৯৭ সালে বিষ্ণুপুরে প্রথম পূজা করেন মল্ল রাজবংশের রাজা জগৎ মল্ল। তবে ঐতিহাসিক তথ্য যাই হোক না কেন, দুর্গাপূজার ব্যাপ্তিই এর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। সেই ব্যাপ্তি কেবল ভারত তথা বিশ্বজুড়েই নয়, এর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন অন্যান্য ভাষাভাষীরাও। তাই 'যেখানে বাঙ্গালি সেখানেই দুর্গাপূজা' এই অভিধা এখন অনেকটাই বদলে গেছে। তবে বাঙ্গালি থাকবে অথচ দুর্গাপূজা হবে না এটা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু সব জায়গার কথা এক নিবন্ধে তুলে ধরাটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই দুরূহ। এখানে বহির্বঙ্গে কেবল ভারতের সামান্য কয়েকটা জায়গার কথা অতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। যা বিভিন্ন দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

দিল্লি

দিল্লি ভারতের রাজধানী। সারা বিশ্বের বহু রকমের মানুষ এখানে আসেন ও থাকেন। এরকম একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ২,৫০০-রও বেশি বারোয়ারি দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। বাঙ্গালিদের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এর আয়োজন করে থাকেন অবাঙ্গালিরাও। কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় ১৯১১ সালে। তার প্রায় ২৯ বছর আগে ১৮৮২ সালে যমুনা নদীর ধারে কাগাজি মহল্লায় প্রথম দুর্গাপূজা হয়। উদ্যোক্তা-আয়োজনকারীরা সকলেই ছিলেন অবাঙ্গালি। দেশের রাজধানী হবার পর বাঙ্গালিরা দিল্লিতে প্রথম পূজা করেন ১৯২২ সালে। ওই বারোয়ারি পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন পরমেশ্বর বিশ্বাস। তবে পূজার জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন অবাঙ্গালিরা। বিল্লিসারণে এক ধর্মশালার পরিসরে। প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাশী থেকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ওই ধর্মশালায় প্রতি বছর যাতে পূজা হয় সেজন্য ধর্মশালার মালিক লালানাদ নারায়ণ উইল করে গেছেন। আর একটা বিষয় হলো, তিন দশক আগেও কলকাতায় অনেক মণ্ডপে সারারাত ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। গান-বাজনা, কৌতুকাভিনয় ইত্যাদি হতো। মুম্বই থেকেও নামকরা শিল্পীরা আসতেন। এখন আর তেমন দেখা যায় না। কিন্তু দিল্লিতে হয়ে থাকে। কলকাতা থেকে অনেক শিল্পী যান। কোনো কোনো পূজায় স্থানীয়রা অনেক দিন ধরে মহড়া দিয়ে নাটক, যাত্রাপালাও মঞ্চস্থ করে থাকেন।

তুরা

'মায়াময় মেঘালয়'-এর গারো হিল্‌স-এর সদর হলো তুরা। গুয়াহাটি থেকে ২০০ কিলোমিটার মতো দূরে বর্ষারণ্য বেষ্টিত ছোটো শহর। নগর সভ্যতার দৃষ্টিতে প্রায় প্রত্যন্ত অঞ্চল বলা যেতে পারে। হিন্দু বাঙ্গালির সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। তবুও প্রতি বছর তুরাতে ২৫টার মতো দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। পুরো গারো পাহাড় এলাকায় শতাধিক পূজা হয়ে থাকে। বাঙ্গালিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনেক পূজা করেন স্থানীয় নেপালি এবং কোচ ও হাজং জনজাতির লোকেরাও। বাদ যায় না বিহারী, মাড়োয়ারীরাও। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, বাঙ্গালিরা নয়, ১৮৮৫ সালে তুরাতে প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ানরা। মুখ্যত নেপালিদের দ্বারা শুরু হওয়া সেই পূজা হয়েছিল তুরার প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন 'মেঘালয় ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এর প্রাঙ্গণে। সেই থেকে ১৪০ বছর ধরে এখনোও মহা ধুমধামে তা চলে আসছে। এই পূজা বিশেষভাবে 'নেপালি দুর্গাপূজা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বাঙ্গালিদের দ্বারা উদ্‌যাপিত প্রথম এবং অন্যতম প্রধান পূজা হয় সেখানকার বাবুপাড়ায়। প্রায় ১০০ বছর আগে এই পূজা শুরু হয়েছিল। আড়ম্বর দেখলে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও হচ্ছে। সমগ্র গারো পাহাড়ে সব দুর্গাপূজা যাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত সম্পন্ন হয় সেজন্য ২৬ বছর আগে 'সেন্ট্রাল পূজা কমিটি' তৈরি হয়েছে। প্রায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এই সমিতি। দশমীর দিন তুরার সব প্রতিমা একত্রিত হয় সেখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে।

ফঃ ২

তারপর বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে একে একে বিসর্জন দেওয়া হয় বাবুপাড়া বিসর্জন ঘাটে। এই শোভাযাত্রা বিশেষ আকর্ষণীয় এবং দুচোখ ভরে দেখার মতো। বারোয়ারি পূজাকে 'সর্বজনীন' বলা হয়ে থাকে। গারো হিল্‌স-এর সদরে আয়োজিত দুর্গাপূজা প্রায় আক্ষরিক অর্থেই তাই।

অসম

দশম-একাদশ শতকে রচিত 'কালিকাপুরাণ' থেকে জানা যায় যে তারও আগে থেকে অসমের তাম্রেশ্বরী মন্দিরে দুর্গাপূজা হতো। তবে তা তেমন জনপ্রিয় হয়নি। ১৬২০ সালে অহোম রাজা স্বর্গদেব রুদ্রপ্রতাপ সিংহ গারগাঁওয়ে পূজা করেন। পরে ওই পূজা জোরহাটে বুড়ি গোঁহাই দেবালয়ে স্থানান্তরিত হয়। এটাকেই বেশিরভাগ মানুষ অসমে প্রথম দুর্গাপূজা বলে মনে করেন। আবার ভিন্নমতে গৌরীপুর রাজবাড়িতে প্রথম পূজা করেন রাজা কবিশেখর। আর গুয়াহাটিতে দুর্গাপূজার প্রচলন হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। অহোম রাজবংশের রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহের হাতে। উল্লেখিত সব পূজা এখনো বহাল রয়েছে। অসমে বারোয়ারি দুর্গাপূজার প্রচলনও শুরু হয় সেই সময় থেকে। গুয়াহাটিতে এখন ঠিক কতগুলো দুর্গাপূজা হয় তার তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু বাঙ্গালি, পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপূজা।

গুয়াহাটির পূজার একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিসর্জন শোভাযাত্রা। শহরের প্রধান রাস্তাগুলোর দুই ধারে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থেকে মা দুর্গাকে বিদায় জানান। যতদূর জানা যায়, আগে উদ্যোক্তারা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অতি দরিদ্র মানুষদের আঁচলে কিংবা ধুতির খোঁটে চাল ঢেলে এককথায় 'অন্নদান' করতেন। কালক্রমে এখন সেটাই চাল ছড়ানোর প্রথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই চাল কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে কিংবা কুলুঙ্গিতে রাখেন।

অসমকে মুখ্যত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। নামনি অসম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। আর উজানি অসম বা বরাক উপত্যকা। গুয়াহাটি নামনি বা নিম্ন অসমে। দুই ক্ষেত্রেই দুর্গাপূজার সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ'র 'কাছাড়ের 'ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বরাক উপত্যকায় ২৪৪ বছর আগে কাছাড়ের জমিদার বাড়িগুলোতে পাল্লা দিয়ে দুর্গাপূজা হতো। বিশেষ করে এখনকার হাইলাকান্দিতে। হাইলাকান্দি তখন কাছাড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওইসব পূজায় তখন ঢাকের বাদ্যের বাজানো হতো বড়ো বড়ো কাঁসর-ঘণ্টা। শিলচর শহরের পত্তন হয় ১৮৩০ সালে। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ শাসন চালু হবার পর শ্রীহট্ট থেকে প্রচুর বাঙ্গালি শিলচরে আসতে থাকেন। সেই সময় শহরের মারুয়াগঞ্জে একজন বাঙ্গালি আড়তদার বটুবাবু দুর্গাপূজা শুরু করেন। সে পূজা এখনও চলছে। বটুবাবুর আগে শিলচরে দুর্গাপূজা শুরু করে গোর্খা রেজিমেন্ট। সেই প্রাচীন পূজায় মোষ বলি দেওয়া হতো। গুয়াহাটির সংখ্যা পাওয়া না গেলেও শিলচরে এখন ১০০-র বেশি পূজা হয়ে থাকে। সরকারি তথ্য অনুসারে ২০২৪ সালে ২২টা জেলা সমন্বিত অসমে নথিভুক্ত বারোয়ারি দুর্গাপূজা হয়েছিল ৪ হাজার ৮০৪টি।

মুম্বাই

দেবী চণ্ডীর অন্য এক রূপ মুম্বাদেবীর নামানুসারে বর্তমান মুম্বাই মহানগরীর নামকরণ হয়েছে পূর্বতন নাম বোম্বাই থেকে। এখানকার বিভিন্ন স্থানে খুব ধুমধাম ও আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। দাদার এলাকায় শিবাজী পার্কের পূজা দেখলে মনে হবে যেন কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মতো কোনো জমকালো পূজা দেখছি। শিবাজী পার্কে 'বেঙ্গল ক্লাব' ১৯২২ সালে এই পূজা শুরু করে। এখন প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষের মতো ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। প্রায় একই রকম পূজা হয় প্যারেলেও। যতদূর জানা যায় ভারতের এই বাণিজ্যিক রাজধানীতে প্রথম দুর্গাপূজা করেন রাজা প্রতাপ সিংহ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বাঙ্গালি জলুরিরা (সোনারুপোর অলঙ্কারের কারিগর) বেশ ভালো সংখ্যায় মুম্বাইয়ে আসার পর কলবাদেবী এলাকায় ১৮৮০ সালে তাঁরা চাঁদা তুলে বেশ বড়ো করে পূজা করেন। সেটাই ছিল মুম্বাইয়ে প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা। এখন এই এলাকাতে বেশ কয়েকখানা বড়ো পূজা হয়ে থাকে। শিবাজী পার্কের দুর্গাপূজার প্রচুর নামডাক থাকলেও এক সময় মুম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ পূজা ছিল পূর্ব প্যারেলে। এখনো এখানকার পূজায় মায়েদের সিঁদুরখেলা অত্যন্ত গরিমাময়। দশমীর দিন মহানগরের অনেক দূর দূর থেকে মায়েদের আগমন ঘটে থাকে এখানকার নারে পার্কের পূজায়। মুম্বাইয়ে বসবাসকারী অভিজাত বাঙ্গালি ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ চাকরিজীবীরা একটু পারিবারিক ঢঙে কিন্তু বিপুল আয়োজনে পূজা করেন পেডার রোডে অবস্থিত তেজপাল হলে। 'বম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতি' এই পূজার আয়োজন করে থাকে। দুর্গাপূজার সংখ্যা বাড়ছে নবী মুম্বাইয়েও। এখন বৃহত্তর মুম্বাইয়ে ১৫০টারও বেশি বারোয়ারি পূজা হচ্ছে।

মুম্বাইয়ে দুর্গাপূজার একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, চলচ্চিত্র জগতের বহু খ্যাতনামা অভিনেতা ও সংগীত শিল্পীদের আগমন ও আত্মনিয়োগ। চলচ্চিত্র প্রযোজক শশধর মুখার্জির উদ্যোগে পশ্চিম সান্তাক্রুজে দুর্গাপূজা শুরু হয়। ওই পূজায় চলচ্চিত্র জগতের অনেক রথী- মহারথীদের আগমন ঘটত। জুহু সৈকত সংলগ্ন আন্ধেরি এলাকাটি এখন এককথায় 'বলিউড' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে কয়েকখানা পূজা হয়ে থাকে। খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী জগন্ময় মিত্র এক সময় এখানকার দুর্গাপূজা কমিটিতে পর পর তিন বছর সভাপতি ছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, অভিনেতা 'দাদামণি' (অশোক কুমার), প্রদীপ কুমার প্রমুখ এখানকার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে অংশ

নিতেন। এখন বেশ কয়েক বছর ধরে খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজা হচ্ছে নামকরা সংগীত শিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্যর বাড়িতে। এবছর জাতীয় পুরস্কার লাভ করা অভিনেত্রী রানি মুখার্জিও প্রতি বছর দুর্গাপূজা করে থাকেন। পূজার কদিন বলিউড ও টলিউডের বিশিষ্ট শিল্পীদের সমাগম ঘটে এখানকার দুর্গাপূজাগুলোতে।

বারাণসী

এক সময়ের 'দ্বিতীয় বঙ্গ' বারাণসীতে এখনো প্রায় তিন লক্ষের মতো বাঙ্গালি রয়েছেন। তাই এখানে ভালো সংখ্যায় দুর্গাপূজা হবে এতে নতুনত্বের কিছু নেই। উপরন্তু এই 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে' দুর্গাপূজা করলে বেশি পুণ্য হয় এমন প্রবাদ অনেক আগে থেকে চলে আসছে। এই সূত্রে অবিভক্ত বঙ্গ থেকে অনেক সম্পন্ন পরিবার কাশীতে এসে দুর্গাপূজা করতেন। ১৭৭০ সালে শুরু করেছিলেন একজন চৌখিম্বর জমিদার আনন্দমোহন মিত্র। সে পূজা এখনো হচ্ছে। প্রায় একই সময়ে কেদারঘাটের বাপলি পরিবারও কাশীতে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন।

এই হিসেবে বারাণসীতে আড়াইশো বছরেরও বেশিদিন আগে থেকে এই পূজা হচ্ছে। তবে প্রথম বারোয়ারি পূজা শুরু হয় ১৯২১ সালে। ১০৪ বছর আগে সেই পূজা হয়েছিল নাদেশড়ে মিনিট হাউসে। উদ্যোক্তা ছিলেন রায়বাহাদুর ললিত সেন রায়। জায়গাটা বারাণসীর প্রাণকেন্দ্র গোদৌলিয়া থেকে কিছুটা দূরে বলে পরের বছর পাণ্ডে হাভেলিতে অ্যাংলো-বেঙ্গলি প্রাইমারি স্কুলে বারোয়ারি পূজা শুরু হয়। দু' বছর পরে ১৯২৩ সালে গঠিত হয় 'বারাণসী দুর্গোৎসব সম্মিলনী'। প্রথম তিন বছর পূজা হয়েছিল হ্যাজাগ লাইটের আলোয়। ২০২৪ সালে জেনারেটারের আলোয় মহা আড়ম্বরে পূজা করে এই সম্মিলনী।

এখন বারোয়ারি পূজাগুলোতে অবাঙ্গালিদেরও অংশগ্রহণ উল্লেখ করার মতো। বারাণসীতে অষ্টাদশ শতকে নাটোরের রানি ভবানীর হাতে প্রতিষ্ঠিত দুর্গাকুণ্ড মন্দিরের পূজা ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। প্রতি বছর বেশ বড়ো এবং রীতিমতো আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরের মধ্যেও। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বারাণসীতে এত বেশি বাঙ্গালির আগমন ঘটে যে পূজার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে বিখ্যাত গঙ্গারতির সময় বাংলা ভাষাতে যাবতীয় ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

মদনপুরা বাঙ্গালিটোলার পুরনো দুর্গাবাড়ির পূজারকাল আড়াইশো বছরেরও বেশি। কিন্তু এখানকার প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে একটা অলৌকিক কাহিনি আছে।' মাটির প্রতিমা প্রয়োজনে সময়ে সময়ে কলেবর পালটানো হলেও বিগত আড়াইশো বছর ধরে কখনো বিসর্জন দেওয়া হয় না। একটা সরু গলির মধ্যে ১৭৬৭ সালে এই মন্দির বা দুর্গাবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন মূলত হুগলি জেলার জনাইয়ের বাসিন্দা। বাঙ্গালিটোলার স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য অনুযায়ী কালীবাবু 'পুরানি দুর্গাবাড়ি'-তে পূজা করার পর দশমীর দিন যখন বিসর্জন দেবার চেষ্টা করেন তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। লোকজন মিলে শত চেষ্টাতেও মৃন্ময়ী মূর্তিকে ওঠানো তো দূরের কথা, একচুল নড়ানো পর্যন্ত যায়নি। সেদিন রাতে দেবী দুর্গা কালীবাবুকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন যে তাঁর মূর্তিকে যেন বিসর্জন না দেওয়া হয়। কারণ কাশীবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি যেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেখানেই থেকে যেতে চান।

রাজস্থান

দেবী দুর্গা ঘোটকে আসুন কিংবা গজে অথবা নৌকায়, মরুরাজ্য বলে কথিত রাজস্থানেও বিভিন্ন জায়গায় তাঁর অকাল বোধন ও পূজা হয়ে থাকে। এই মরুরাজ্যে এখন প্রতি বছর ৫০টারও বেশি দুর্গাপূজা হচ্ছে। ঐতিহাসিক শহর যোধপুরে আধ ডজনের মতো পূজা হয়। ২০০০-এর কিছু কিছু বাঙ্গালি এই শহরে থাকেন। এই সূত্রে গঠিত হয়েছে 'যোধপুর দুর্গাবাড়ি সমিতি।' তাঁদের আয়োজিত বারোয়ারি পূজাই এখন এখানকার প্রধান দুর্গাপূজা। এ বছর ৮৪ বছরে পড়ল। এত বছর ধরে একটানা চলে আসছে। এমনকী ২০২০-২১ সালে কোভিড অতিমারির সময়ও বন্ধ হয়নি। সে সময় কোভিড প্রটোকল মেনে পূজা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সমিতির দীর্ঘদিনের সভাপতি মিলন সেনগুপ্ত।

২০২১ সালে ইউনেস্কো প্রকাশিত 'দ্য ইনট্যাঞ্জিবল্ কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি'র তালিকায় স্থান করে নিয়েছে 'কলকাতার দুর্গাপূজা'। ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক আগে থেকেই বাঙ্গালির দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। বিশ্বের যে প্রান্তেই বাঙ্গালি পৌঁছেছে, বসতি স্থাপন করেছে এবং নানা কৃতিত্ব অর্জন করেছে, সেখানেই জনপ্রিয় হয়েছে মা দুর্গার আরাধনা। এক কথায় বলা যায় যে, বাঙ্গালি ও দুর্গাপূজা সমার্থক। এক শতক ধরে ঘটে চলেছে দুর্গাপূজার বিশ্বায়ন। ব্যতিক্রম হলো জেহাদি শক্তির কবলে থাকা— বাংলাদেশ। শ্রীশ্রী দুর্গার কৃপায় সেখানেও একদিন পট পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গা আরাধনা এবং বাঙ্গালির উত্তরাধিকার

অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব বিষয়ে আখ্যান খুঁজে পাই। রাবণ বধ করবেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু রাবণ যে দেবী অম্বিকাকে আগেই স্মরণ করে রেখেছেন! রাবণের স্তবে দেবী হৈমবতীর মন আর্দ্র হয়েছে, উচাটন হয়েছে। রাবণের স্তবে দেবী অভয়া অভয়দানও করেছেন।

'স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ।।'

যুদ্ধে এসে রঘুপতি দেখলেন, রাবণের রথে বসে আছেন স্বয়ং হৈমবতী। নিজের ধনুর্বাণ ফেলে দিলেন তিনি, তাঁকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করলেন। ব্যাঘাত ঘটল রাবণ-বিনাশের। তাহলে কী হবে! বিমর্ষ হয়ে ভূতলে বসে পড়লেন। কী উপায়! বিধাতাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বিধি বললেন, অকালবোধন করে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করতে হবে। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, দেরি না করে তাই হোক। রাবণ বধের সলতে পাকানো শুরু হলো। সেই শরতে প্রজাপতি ব্রহ্মা বোধন করলেন দেবী দুর্গার, ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ হলো। দেবতাদের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র মহামায়ার পূজা শুরু করলেন। নিশা প্রভাত হলো। বিধির বিধান মেনে শ্রীরামচন্দ্র স্নানদান সেরে প্রস্তুত হলেন। বনের ফুলে-পল্লবে, ফল-মূলের নৈবেদ্যে সমুদ্রের তীরে পূজায় বসলেন তিনি। চণ্ডী-স্তবও রচনা করলেন।

'পূজি দুর্গা রঘুপতি,
করিলেন স্তুতি-নতি,
বিরচিল চণ্ডী-পূজা গান।।'

চণ্ডীপাঠ করলেন নিজেই। দেবীর স্তবস্তুতি হলো। বানরবাহিনী জয়ধ্বনি দিল। তারা প্রেমানন্দে দেবীর গুণ বর্ণনাত্মক গান গাইছে। এভাবে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামল।

'সায়াহ্নকালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাধিবাসন।।'

রামচন্দ্র নিজেই দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে নিয়েছেন। শাস্ত্র নির্ধারিত আচারে দেবীর অধিবাস সম্পন্ন করছেন। দেবী আরাধনার নবপত্রিকা রূপ রচিত হয়েছে। নবপত্রিকার এক একটি উদ্ভিদে এক এক মাতৃদেবীর অধিষ্ঠান। তাঁরা দেবী দুর্গারই রূপভেদ। তাঁদের সম্মিলিত রূপ এই নবপত্রিকা।

'আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।।'

শাস্ত্রের পদ্ধতি ও নিয়ম মেনেই শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। ভক্ত হনুমান ত্রিভুবন ঘুরে সমস্ত উপচার সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন।

'এইরূপে উদ্যোগ করিলা দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লেখ আছে, বেদ-বিধিমতে শ্রীরামচন্দ্র সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা, নবমীবিহিত পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। সঙ্গে ছিল দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীতের আয়োজন।

'শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীত নাট চণ্ডীপাঠে দিবা-অবসান।।'

নানান বন্যফল এনে নৈবেদ্য সাজিয়েছে কপিবাহিনি। পূজায় যেসমস্ত ফুল বানরবাহিনী সংগ্রহ করে এনেছিল তার মধ্যে পাওয়া যায় অশোক, কাঞ্চন, জবা, মল্লিকা, মালতী, পলাশ, পাটলী, বকুল, গন্ধরাজ, স্থপদ্ম, কদম্ব, পারুল, রক্তোৎপল, শতদল কুমুদ, পারিজাত, শেফালী, করবী, কনক-চম্পক, অতসী, অরাজিতা, চম্পক, নগেশ্বর, কাষ্ঠমল্লিকা, দোপাটি, জাতি, যূথী, আচিঝাঁটি, দ্রোণপুষ্প, মাধবী, টগর, তুলসী, তিসি, ধাতকী, ভুঁইচাঁপা, কেতকী, পদ্ম, বক, কৃষ্ণকলি, স্বর্ণ-ধূথিকা, বান্ধুলী, আঁধুলী, কুরচি, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া ফুলের নাম।

ষোড়শোপচারে পরমানন্দে শঙ্করী পূজা করছেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু দেবীর দয়া, আর্দ্রতা কোথায়? দেবী কি বঞ্চনা করবেন তাঁকে! সীতাদেবী কি উদ্ধার হবে না?

'নয়নে বহিছে ধারা অসুখী অন্তর।
কাঁদেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর।।'

কাতর হয়ে পড়েছেন তিনি, তখন বিভীষণ বললেন—

'তুষীতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তরশত নীলোৎপল কর দান।'

দেবী আরাধনায় লাগবে নীলপদ্মের জোগান! কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?

হনুমান দায়িত্ব নিলেন নীলপদ্ম সংগ্রহ করার। বললেন—

'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল।।'

বিভীষণ জানাচ্ছেন দেবীদহে একমাত্র নীলপদ্ম ফোটে। শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে হনুমান গেলেন সেখানেই। একশত আট পদ্ম তুলে দ্রুত এলেন তিনি। গুনে গুনে প্রভুর হাতে দিলেন পঙ্কজ ফুল। শ্রীরাম দেবীকে পদ্ম প্রদান করার সংকল্প করলেন। কিন্তু পরীক্ষা করবার জন্য দেবী আগেই একটি পদ্ম হরণ করে নিয়েছেন।

'করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হরমনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তাঁর,
মহেশ্বরী পরাৎপরা।'

এক পদ্মে কমতি হচ্ছে! বিস্মিত শ্রীরমচন্দ্র। সংকল্প তবে কি ভঙ্গ হবে? কী উপায়! পুনর্বার হনুমানকে বললেন, দেবীদহে গিয়ে আর একটি পদ্ম নিয়ে আসতে। হনুমান বললেন—

'শুন হে গোঁসাই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে,
পঙ্কজ হরিলা কালী।'

বিড়ম্বনা কাটাতে শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবী কালিকার স্তুতি করছেন।

'বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মন প্রতি দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার।'

দেবীর পদতলে কাতর হয়ে পড়ে আছেন শ্রীরামচন্দ্র। দুঃখিত অন্তরে তিনি কাঁদছেন। বলছেন, সমুদ্রের ভিতর ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন তিনি। অবশেষে তাঁর মনে হলো, লোকে তো তাঁকে 'নীলকমলাক্ষ' বলে, তাঁর দুটি নয়ন। এরই একটি তিনি দেবীর কাছে নিবেদন করবেন।

'যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সংকল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল।।
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে।'

স্তব করতে করতে কাঁদছেন শ্রীরাম। এরপর তিনি তূণীর থেকে বাণ নিয়ে চক্ষু উপড়াতে যাবেন, এমন সময় দেবী দুর্গা তাঁর হাত ধরলেন।

'চক্ষু উপড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে।।'

এবার রাবণ বধের জন্য দেবীর আদেশ এল। দেবী বলছেন, পরমা প্রকৃতি জানকীকে হরণ করবে, এ সাধ্য কি রাবণের আছে? আসলে রাক্ষস বিনাশ করাতে সমুদ্রের মাঝে সেতু বাঁধিয়ে সীতা হরণের ছল করে শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে আনা হয়েছে। না হলে রাক্ষস বিনাশ হবে না, আসুরিক শক্তি নিধনও হবে না! দেবী বলেছেন,

'অকালবোধনে পূজা কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলা প্রকাশ।'

এই হলো অকাল বোধনের কাহিনি। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবী দুর্গার পূজা করে দশমীর দিন মহেশ্বরীকে বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম করতে চললেন রঘুপতি রাম। যুদ্ধে বিজয়ী হলেন এবং মাতৃশক্তিকে আসুরিক শক্তির কবল থেকে উদ্ধার করে, দানব শক্তির বিনাশ সাধন করলেন। সেই থেকে মর্ত্যে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন হলো। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হয়ে উঠেছে এই দুর্গাপূজাই। তাই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বাঙ্গালি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। □

দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্রস্থল

রবিব্রত ঘোষ

বঙ্গে দুর্গাপূজা ব্যাপক প্রচলিত হয়েছিল ১৭৫৭ থেকে। সে বছরই পলাশীর যুদ্ধ জয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজা নবকৃষ্ণদেব কলকাতার শোভাবাজারের বাড়িতে খুব ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এই উৎসবে যোগ দেন। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে পালিত এই দুর্গাপূজায় কোম্পানির ইংরেজ কর্মকর্তাদের আগমনে তা বিজয় উৎসবে পরিণত হয়। সে আমলের কিছু ধনী জমিদারদের কাছে সিরাজের এই পরাজয় ছিল ইসলামিক শাসন থেকে মুক্তির সোপান। তাই ক্লাইভকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই রাজা নবকৃষ্ণ দেব-সহ আরও অনেকেই মহা ধুমধামে দুর্গাপূজা করেন।

বঙ্গে দুর্গাপূজার শুরুটা এমনভাবে হলেও এই দুর্গাপূজা পরবর্তীকালে মাতৃবন্দনায় পরিণত হয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। এর পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেশমাতৃকাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে বন্দনা করেছেন। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' গানের শেষে দুর্গার বন্দনা আছে। সেখানে বলা হচ্ছে,--- বাহুতে তুমি মা শক্তি/হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহণধারিণী।

এই উপন্যাসেই মহেন্দ্রকে সন্ন্যাসী ভবানন্দ দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি দর্শন করিয়ে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করেন। বঙ্কিম-বর্ণিত কালী হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। জমিদার মহেন্দ্রকে দেবালয়ের কালীমূর্তির সামনে এনে সত্যেন্দ্র ব্রহ্মচারী বলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।' মায়ের উগ্রচণ্ডী মূর্তি ধারণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, 'কালী— অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান— তাই মা কঙ্কালমালিনী।' এর পর জ্যোতির্ময়ী দশভুজা দুর্গার সামনে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'মা যা হইবেন। দশ ভুজা দশ দিকে প্রসারিত— তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত...।' আনন্দমঠের কালী বা দুর্গা ভারতমাতার দুই বিপ্রতীপ অবস্থানের কল্পিত রূপ। কালী সমকালীন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ইঙ্গিতবাহী, আর মা দুর্গা মহাশক্তিশালী অসুরদলনী।

পরবর্তীকালে অগ্নিযুগের বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ নিজের বাড়িতেই দুর্গা বা অম্বা মন্দির স্থাপন করেন : তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর কলকাতার ৩৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে এক অভিনব দুর্গাপূজা হয়। দেবীর মূর্তির বদলে সেদিন সেখানে পূজিতা হন নানা অস্ত্র। ভারতের বিপ্লবী চেতনার বিকাশে শ্রীঅরবিন্দ রচিত ভবানী মন্দিরে, শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, 'আমরা শক্তিকে ত্যাগ করিয়াছি, শক্তিও আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে, বাহুতে মা নাই।'... যা আমাদের সর্বাগ্রে অর্জন করা উচিত তা শক্তি— শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি এবং সবার উপরে সকল জিনিসের অন্তহীন ও অবিনশ্বর উৎস, আধ্যাত্মিক শক্তি। যদি শক্তি পাই তবে অন্য সব জিনিস সহজে আপনিই আসিবে।... যে শক্তিরূপিণী মায়ের পূজা করিতেন রামকৃষ্ণ... তিনি কালী, ভবানী।' শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভবানী মন্দিরে বলেছেন, 'আমরা এমন কয়েকজন লোক হইয়া একটি মূল কেন্দ্র গড়িতে চাই যাহাদের মধ্যে শক্তি চরম পূর্ণতা লাভ করিবে,... বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে অগ্নিময়ী ভবানীকে ধারণ করিয়া তাহারা আমাদের দেশের দূর দূরান্তরে বিচরণ করিবে, সে শিখা ছড়াইয়া দিবে।' এ সবই ছিল বিপ্লবের গোপন প্রস্তুতি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই দুর্গাপূজা স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। বিপিন চন্দ্র পাল তখন 'স্বদেশি পূজা' উৎসবের আয়োজন করেন, যা দেশীয় পণ্যের প্রচার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরোধিতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

১৯১৯ সাল। বঙ্গ জুড়ে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। কলকাতা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম সবত্রই স্বদেশি ভাবধারায় জেগে উঠছে এক নতুন প্রজন্ম। এখানে সেখানে প্রতিদিন গড়ে উঠছে ছোটোখাটো বিপ্লবী দল। এমন কয়েকটি বিপ্লবী আড্ডায় ঠিক হলো, সবাইকে এক ছাদের তলায় আনতে হবে। তবেই স্বদেশি আন্দোলনে সফলতা আসবে। তার জন্য সেরা উপায় হলো দুর্গাপূজা। ঠিক করা হলো, দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ্য করে স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবকদের সংগঠিত করা হবে। উৎসবও হবে আর দেবী বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকার বন্দনায় তরুণ প্রজন্মকে জাগরিত করার কাজও হবে। ১৯২৫ সালে মান্দালয় জেলে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র বসু দুর্গাপূজা আয়োজনের অনুমতি চান। প্রথমে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে চায়নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বন্দিদের অনশনের ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুমতি দিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে দুর্গাপূজা কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একতাবদ্ধ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে

উঠেছিল।

কলকাতার বহু বারোয়ারি দুর্গাপূজা এক সময় ছিল বিপ্লবের কর্মস্থল। এর সব থেকে ভালো উদাহরণ হলো উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা, যার আরম্ভ হয়েছিল ঋষি অরবিন্দ ও বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু নেতৃত্বে। এই সমিতি ছিল লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনা, কুস্তি খেলা প্রভৃতি শেখার প্রধান আখড়া। দেশমাতৃকার আরাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে অতীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে দুর্গাপূজার শুরু করেন। সারা বছরের শরীরচর্চা আর সাহসিকতার পরীক্ষার দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হতো মহাষ্টমীর দিনটিকে। এই দিনটি তাঁরা বীরাষ্টমী দিসব হিসেবে পালন করতেন। এই বীরাষ্টমী অনুষ্ঠানে দেবী দুর্গার সামনে লঠিখেলা, ছুরিখেলা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ আর তরবারি খেলার মাধ্যমে সাহস আর শক্তি দেখানোর পরীক্ষা হতো।

সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এই বারোয়ারি পূজা কমিটির গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি বেশ কয়েক বছর এই বীরাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯২৮ সালের সিমলা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সে বছর খুব জাঁকজমকভাবে বীরাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিরা।

১৯৩০ সালে নেজাজী কলকাতা পুরসভার মেয়র নির্বাচিত হন। ওই বছরেই সিমলা ব্যায়াম সমিতি সুভাষচন্দ্র বসুকে সমিতির পক্ষ থেকে গঠিত সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করে। নেতাজীর উদ্যোগে ও স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজাতে প্রতিমাকে তখন দেশীয় খাদি বস্ত্র পরানোর রীতি শুরু হয়। দেবীর পরনের অলঙ্কার সবই মাটির। অস্ত্র দেশীয় লোহা, তামার। বীরাষ্টমী উৎসব ছাড়াও মণ্ডপে পুতুলখেলা, যাত্রাপালা ও কবিগানের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হতো। এছাড়াও পূজাপ্রাঙ্গণে বিভিন্ন বাণী লেখা পোস্টার শোভা পেত। সে সময়ের ইংরেজি পত্রিকা 'অ্যাডভান্স'-এ সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজাকে 'স্বদেশি ঠাকুর' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার সাহস করতো না। কিন্তু সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজায় বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় ১৯৩২ সালে ইংরেজ সরকার এই পূজাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরপর তিন বছর এ পূজা বন্ধ ছিল। ১৯৩৯ সালে আবার নতুন করে এই পূজা শুরু হয়। এবার এ পূজায় অগ্রণী ভূমিকা নেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯১৯ সালে বাগবাজার সার্বজনীন 'দুর্গাপূজা শুরু হয়। ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার অল্ডারম্যান দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি হন। তারই উদ্যোগে এই পূজা এক নতুন রূপ পায়। দেশাত্মবোধ ও স্বাদেশিকতার চেতনাবোধ জাগাতে তিনি এই পূজার নামকরণ করেন, 'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী'। প্রকৃতপক্ষে ওই বছর থেকেই এই পূজার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু। এই দুর্গাপূজার যে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো, তা স্বদেশি শিল্পমেলায় রূপান্তরিত হয়। দুর্গাচরণের উদ্যোগেই পূজার সঙ্গে যুক্ত হয় দেশীয় শিল্প সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী। গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে কলকাতার মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিতেই মূলত তার এই পদক্ষেপ। সে বছরই সুভাষচন্দ্র এই পূজার সঙ্গে যুক্ত হন। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ১৯৩০ ও ১৯৩৯ সালে তিনি বাগবাজারের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এই পূজামণ্ডপে স্বদেশি পণ্যের প্রদর্শনী, দেশাত্মবোধক নাটক ও গান পরিবেশন করা হতো। এমনকী দেবী দুর্গাকে খাদির কাপড় পরিয়ে স্বদেশি আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় অনুশীলন সমিতির লাঠিখেলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি প্রদর্শন করার জায়গা ছিল বাগবাজার সার্বজনীন পূজাপ্রাঙ্গণ। এই অনুষ্ঠানটি হতো বীরাষ্টমী উৎসবের দিনে। ১৯৩৬ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি সরলা দেবীর পরিচালনায় বাগবাজারে সর্বপ্রথম বীরাষ্টমী উৎসব শুরু হয়। এই পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'কাপুরুষতা, ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পূজার জন্য তৈরি হতে হবে। সে পূজার জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।' উল্লেখ্য, এখনো মহাষ্টমীর দিনে এখানে বীরাষ্টমী উৎসব পালিত হয়।

১৯৩৭ সালে বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সদস্য মিলে কলকাতার হেদুয়ার কাছে কাশী বোস লেনে শুরু করেন একটি দুর্গাপূজা। এই পূজা মণ্ডপে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে বিপ্লবীরা এখানে নিরাপদে তাদের কার্যকলাপ চালাতে পারতেন। পূজার বেদিতে চামড়ার বুট পরে ওঠার সাহস ছিল না পুলিশের। সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে এই দুর্গাপূজার আয়োজন। পূজাতেও এক অভিনব নিয়ম আনলো বিপ্লবীরা। এক জনের বদলে ১১ জন পুরোহিত মিলে শুরু করল মাতৃ আরাধনার। আসলে পূজা করত একজন, আর বাকিরা ছিলেন বিপ্লবীর দল। ছদ্মবেশে মায়ের মণ্ডপেই গোপনে চলত বিপ্লবী কার্যকলাপ।

কলকাতার বিভিন্ন পূজা কমিটি স্বদেশি পণ্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করত। এর মাধ্যমে স্বদেশি শিল্পকে উৎসাহিত করা হতো এবং বিদেশি পণ্য বর্জনের বার্তা দেওয়া হতো। অনেক পূজামণ্ডপে দেশাত্মবোধক গান, নাটক ও আবৃত্তির আসর বসতো। এগুলির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগানো হতো। দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো। এসব সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হতো। এভাবে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল জনসচেতনতা সৃষ্টির একটি কার্যকর মাধ্যম।

শুধু সার্বজনীন পূজাই নয়, অনেক বনেদি বাড়িও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। হাওড়ার শিবপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের জমিদারবাড়িতে পূজায় দেবীর সামনে একটি সাদা পাঁঠা বলি দেওয়া হতো। সাদা পাঁঠাটিকে মনে করা হতো কোনো ব্রিটিশ পুরুষ। ডায়মন্ড হারবারের নন্দী বাড়ির সদস্যরা সরাসরি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এই পরিবারের এক সদস্য একবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন। সেই বছর থেকেই প্রতিবাদস্বরূপ দেবীর গায়ে বিদেশি কাপড়ের পরিবর্তে পরানো হয় স্বদেশি শাড়ি। কলকাতার অনেক বাড়িতেও পূজায় স্বদেশি সামগ্রী ব্যবহারের রীতি শুরু হয়। দশমীতে বিসর্জনের পর অনেকেই খালি পায়ে দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতেন।

তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে আদ্যিবাড়ির ঐতিহ্যপূর্ণ 'শিবদুর্গা'পূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

মধ্য কলকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে মহম্মদ আলি পার্কের বিপরীতে রবীন্দ্র সরণি পর্যন্ত বিস্তৃত তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট কলকাতার এক অন্যতম ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র। মূলত পরিবহণ ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই অঞ্চল। ৩৭/বি তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে আদ্যি পরিবারের বসবাস আনুমানিক দুইশো বছর ধরে। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে এদের জমিদারি এবং প্রচুর সম্পত্তি ছিল এক সময়। পরবর্তীকালে আদ্যি পরিবার কলকাতায় চলে আসেন এবং বর্তমান ঠিকানায় বাস করতে শুরু করেন।

পরিবারের আদিপুরুষ ঈশ্বর আদ্যি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এক রাতে তিনি স্বপ্নে সপরিবারে শিবঅঙ্গে মাতৃরূপিণী মাতৃরূপিণী দুর্গার এক নয়নাভিরাম রূপ দর্শন করেন। আনন্দে আপ্লুত হয়ে স্বপ্নকে রূপ দেন মৃন্ময়ীমূর্তিতে। ১৮৪৯ সালে শুরু হয় আদ্যিবাড়ির 'শিবদুর্গা' পূজা। এবার এদের পূজা ১৭৭তম বর্ষে পদার্পণ করলো। কলকাতার প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বনেদি পরিবারের দুর্গাপূজার মধ্যে তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের আদ্যিবাড়ির 'শিবদুর্গা' পূজা অন্যতম। পাঁচ খিলান বিশিষ্ট সুদৃশ্য চক্‌মেলান ঠাকুরদালান। প্রথমাবধি এই ঠাকুরদালানেই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শিবের কোলে বসে আছেন মা দুর্গা, মায়ের মূর্তি শান্তভাবের। ডান হাতে বরাভয় দান করছেন। দেবীর ডান পাশে উপরে লক্ষ্মী ও নীচে গণেশ, বামপাশে সরস্বতী ও নীচে কার্তিক। ডাকের সাজে সজ্জিতা দেবী দুর্গার শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রসন্নময়ী রূপ দর্শনে ভক্ত হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। জন্মাষ্টমীতে প্রতিমার কাঠামো পূজার পর ঠাকুরদালানেই প্রতিমা তৈরি হয়। একই মৃৎশিল্পী পরিবার পুরুষানুক্রমে প্রতিমার রূপদান করছেন।

মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ তিথি থেকে পূজা, চণ্ডীপাঠ, আরতি শুরু হয়ে যায়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। সপ্তমীর সকালে 'নবপত্রিকা' স্নানে যান জগন্নাথ ঘাটে। ফিরে এসে পূজা ও আরতির পরে গণেশের দক্ষিণপার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপন করা হয়। এরপর সংকল্প, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান করে পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সংকল্প হয় 'আদ্যি পরিবার'-এর নামে।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে যথাক্রমে ১৫ থালা, ১৭ থালা ও ১৯ থালা নৈবেদ্য দেবীকে নিবেদন করা হয়। সন্ধিপূজায় একমণ চাল এবং একমণ কাশীর বাটা চিনি নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি আজও অটুট রয়েছে। অন্নভোগ না থাকায় লুচি, ভাজা-সহ ব্যঞ্জনের সঙ্গে দেবীর ভোগে থাকে নানারকম মিষ্টি।

আদ্যিবাড়িতে পূজা হয় বৈষ্ণব মতে। তাই এখানে পশুবলির প্রথা নেই। সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা ও নবমীতে মহিলারা ধুনো পোড়ান। এই অনুষ্ঠান একান্তভাবে বিবাহিতা মহিলাদের জন্যে। পরিবারের মঙ্গল কামনায় এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। সন্ধিপূজায় ১০৮ প্রদীপ জ্বালানো হয় প্রতিমার সামনে। নবমীর সকালে যথাবিহিত পূজা, পুষ্পাঞ্জলি ও হোমের পর 'দক্ষিণান্ত'। পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করে দুর্গাপূজার সমাপন।

দক্ষিণান্তের পর হয় কুমারীপূজা। অনূর্ধ্বা নবম বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে মালা পরিয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, পায়ে আলতা পরিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়।

১৮৪৯ সাল থেকে দুর্গাপূজায় যে নিয়ম আচার শুরু হয়েছিল, ঈশ্বর আদ্যির উত্তরসূরিরা নিষ্ঠার সঙ্গে তা অব্যাহত রেখেছেন। এমনকী পুরোহিত এবং ঢাকিরা বংশপরম্পরায় আদ্যিবাড়ির পূজার সঙ্গে যুক্ত।

দশমীতে বরণ ও সিঁদুর খেলার পর নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মাতৃমূর্তি কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয় মতি শীল ঘাটে। ফিরে এসে পরিবারের সকলে কলাপাতায় দুর্গা নাম লেখেন। এরপর শান্তিজল গ্রহণ, বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় এবং মিষ্টিমুখ করে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হয়।

প্রতিবেদককে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আদ্যি পরিবারের সদস্য দীপক আদ্য। □

বাংলা সাহিত্যের প্রথম শারদীয়া ও বাংলা শারদীয়া সংখ্যার প্রথম বিজ্ঞাপন

সংকর্ষণ মাইতি

জানা যায়, দেড়শো বছর আগে একজন ব্রাহ্মর হাত দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল। যাঁর হাত দিয়ে প্রকাশ, তিনি হলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৫৭ সাল নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেনের একটি পত্রিকা ছিল— 'সুলভ সমাচার'। তখন পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা চালু হয়নি। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম সম্পাদকের নাম ছাপা শুরু হয়।

কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত 'সুলভ সমাচার'-এ বাংলা সাহিত্যে প্রথম শারদীয়া 'ছুটির সুলভ' প্রকাশিত হয়েছিল। দিনটি ছিল ১০ আশ্বিন, ১২৮০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) বৃহস্পতিবার। 'ছুটির সুলভ' শব্দবন্ধ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে সময়ে দুর্গাপূজার সময় ছুটি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তবে কেশবচন্দ্র সেনের 'ছুটির সুলভ' শারদীয়াতে দুর্গোৎসব বা পূজা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্ম। প্রতিমা পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই শারদীয়ার নামটি ছিল— 'ছুটির সুলভ।'

এখন যেমন শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশের অনেক আগে থেকে কিছু কিছু দৈনিক এমনকী সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখা যায়, সে সময়েও সুলভ সমাচার-এ শারদীয়া 'ছুটির সুলভ'-এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। ১২৮০ সালের ১০ আশ্বিন শারদীয়া 'ছুটির সুলভ' প্রকাশ পাবে— এই উদ্দেশ্যে ১ আশ্বিন, ১২৮০ তারিখে সুলভ সমাচার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

॥ **'ছুটির সুলভ'** ॥

আগামী ছুটি উপলক্ষ্যে সুলভের বিশেষ একখণ্ড বাহির হইবে।

উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা।

দাম কিন্তু ১ পয়সা।

বিজ্ঞাপনে আবেদনটি ছিল এই রকম :

'মজা করে পড়িতে পড়িতে ঘরে যাও। একটা পয়সা দিয়ে সকলের কিনিতেই হইবে। দেখ যেন কেউ ফাঁকি পড়ে না।'

উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যে প্রথম শারদীয়া পত্রিকা ছিল 'ছুটির সুলভ'। আবার সুলভ সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি হলো বাংলা সাহিত্যের শারদীয়া সংখ্যার প্রথম বিজ্ঞাপন।

'ছুটির সুলভ' শারদীয়া পত্রিকাতে কী কী ছবি, মজার মজার বিষয়, কাগজ কী রকম, ছাপা কেমন— এই নিয়ে ৮ আশ্বিন, ১২৮০ (বঙ্গাব্দ) মঙ্গলবার সুলভ সমাচার-এ আরও একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞাপনটি এই রকম :

'আগামী বৃহস্পতিবার 'ছুটির সুলভ' বাহির হইবে। কেমন সুন্দর কাগজ, কেমন পরিষ্কার ছাপা, কেমন মজার ছবি, অথচ কেমন সস্তা দাম! ছেলেবুড়ো সকলেই মজা করিয়া 'ছুটির সুলভ' পড়ো। দেখ যেন কেউ ফাঁকি পড়ো না। ...কত মজার মজার কথা!'

বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ছুটির সুলভ' পড়লেই ছেলেবুড়ো সকলে মজা পাবেন। কীরকম মজা? উল্লেখ্য— ওই সংখ্যায় কোনো লেখকের নাম ছিল না। সংখ্যাটি হলো প্রথম শারদীয়া 'ছুটির সুলভ'।

'সত্যগল্প' এই শিরোনামের গল্পটিতে একটি বিয়ের গল্প রয়েছে। ছেলের বিয়ে দিতে বাবা বরযাত্রী-সহ মহাসমারোহে বাড়ি থেকে সাত ক্রোশ দূরে, কনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। অনেকেই মদ্যাসক্ত। কনের বাড়ি অনেক দূরে, কাজেই প্রত্যুষেই যাত্রা।

কন্যাকর্তাটি আবার ইয়ং বেঙ্গল দলের লোক। তাঁর নাকি দিশিতে মানায় না, বিলিতি না হলে তাঁর রঙ্গ হয় না। কনের মামা অবশ্য নিরামিষাশী। বরকর্তা ও কন্যাকর্তা দুজনেরই মিল সুরাসক্তিতে।

বিয়ের যাত্রাপথে বরের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যাত্রাপথে বিশ্রাম। বিশ্রামে পানাহার। বাজনদার, নাপিত, পুরোহিত, পালকির বেহারা, মায় বরকর্তা পানাহারে ভোঁ। বরবাবাজি পালকিতে। ভাবছেন, বিয়েটা হবে তো?

সন্ধ্যের সময় সবাই কনের বাড়িতে। সেখানেও একই দৃশ্য। বরবাবাজির মনে জিজ্ঞাসা— কখন ছাদনাতলায় ডাক আসবে? কনের মামা বিয়ের লগ্ন ধরে ভাগ্নির বিয়ে সম্পন্ন করেন। পরের দিন কনের শ্বশুরবাড়িতে গমন। বরকর্তার ছেলে ও বউমাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার তোড়জোড়।

ছেলের বাবা বউমাকে দেখতে চাইলে, ছেলে তাঁর স্ত্রীকে দেখাতে রাজি হননি। বাবার প্রতি ক্ষুব্ধ, দারুণ ক্ষুব্ধ। কনের বাড়িতে আসা ইস্তক, কনের বিয়ে পর্যন্ত ইয়ারদের নিয়ে শুধুই পানাহার। বাবা তথা বরকর্তার মানসম্মান বলে কিছুই থাকল না।

ছেলের ব্যবহারে বাবাও ক্ষুব্ধ। বাবার কথার অমান্যি করলে!

ফঃ ৩

‘চল্, বাড়ি চল্, দেখাচ্ছি মজা’— মনে রাগটা পুষে রেখেছেন তিনি। শোনা যায়, পরে ছেলেকে ত্যজ্য করেছিলেন তিনি। গল্পের শেষ এখানেই।

আসলে, গল্পটি সত্য কিনা তা বলা মুশকিল। ধরে নেওয়া যায়, প্রকাশিত গল্পটি ছিল ব্যঙ্গাত্মক। সেই সময়কার বাবুকালচারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সুরাসক্তির পরিণাম কী হতে পারে, তা এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

‘ছবি’ শীর্ষক কার্টুনে ছবি সাজিয়ে লেখা হয়েছে—

‘ওরে বাবা, আমি মদকে খাই না, মদ আমাকে খায়।
ওই কামড়াতে আসছে, পালা, পালা, পালা, পালা।’

মদ্যপানের বিষময় ফলের কথা লিখে পাঠককে সচেতনও করা হয়েছে—

‘ওরে সুরা, তোর অত্যাচারে
বসে বঙ্গমাতা কাঁদে অনিবার নীরবে নির্জনে,
ব্যাকুলিত মনে, সে দুখ হেরিলে বিদরে হৃদয়।’

পত্রিকায় মাতাল ও কুকুরকে অগ্রাহ্য করার কথাও বলা হয়েছে—

‘কুকুরের সম্মুখে ভয় প্রকাশ করিলে সে চাপিয়া ধরে।
কুক্কুর ও মাতাল উভয়কে অগ্রাহ্য করাই তাহাদিগের
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়।’

আমরা দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত। সবাই না। দিবানিদ্রার কুফলও ওই ‘ছুটির সুলভ’-এ প্রকাশিত।

‘দিবসে নিদ্রা লেগে পেটের পীড়া হয়, জ্বরজ্বর ভাব হয়, সহজে ক্রোধ জন্মে, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, মুখশ্রী জঘন্য হয় এবং আপনাকে আপনি গালাগালি দিতে ইচ্ছে করে।’

আজকাল টিভির চ্যানেলে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অনেকে অংশ নেন। সে সময়েও ওই শারদীয়া পত্রিকায় মজার ক্যুইজ ছিল।

প্রশ্ন : এমন নিরাকার জিনিস কী আছে যাহাতে আকার দিলে মানুষের টাকা হয়।

উত্তর : টাক। ...এমন অনেক ধরনের প্রশ্নোত্তর ওই শারদীয়া পত্রিকাতে ছিল।

* * *

কথায় আছে— ‘কবেই কেটে গেছে কালিদাসের কাল।’ কবি কালিদাসকে নিয়ে অনেক গল্প-কাহিনি। কালিদাস শুধু প্রাচীন কালের কবি নন, তিনি একটি কাল। কাল অর্থে সময়। তাঁর সময়ের সঙ্গে এখনকার সময় মেলানো যাবে না। সে রকম কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শারদীয়া পত্রিকা ‘ছুটির সুলভ’ প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল সেই সময়কার নিরিখে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে মেলানো যাবে না। তবে তিনি যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শারদীয়া পত্রিকার পথিকৃৎ, এটা মানতেই হয়।

আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এগিয়ে চলাই সভ্যতার ধর্ম। তার মানে এই নয় যে, অতীতকে ভুলে যাওয়া। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়। ‘History educates us।’ সে-রকম ‘Looking back moving ahead।’ সামনের দিকে এগোতে গেলে পেছনের দিকটা দেখে নিতে হয়। কারণ, অনেক কিছুর সূচনা অতীতে। অতীতকে ঘেঁটে নিজেকে জানতে হয়। জানার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

আজ যেটা ঘটে
কাল সেটা পুরনো,
পুরনোকে ঘেঁটে
নিজেকে জানো।

আজকে শারদীয়া পত্রিকার রমরমা। দিশারি কেশবচন্দ্র সেন।

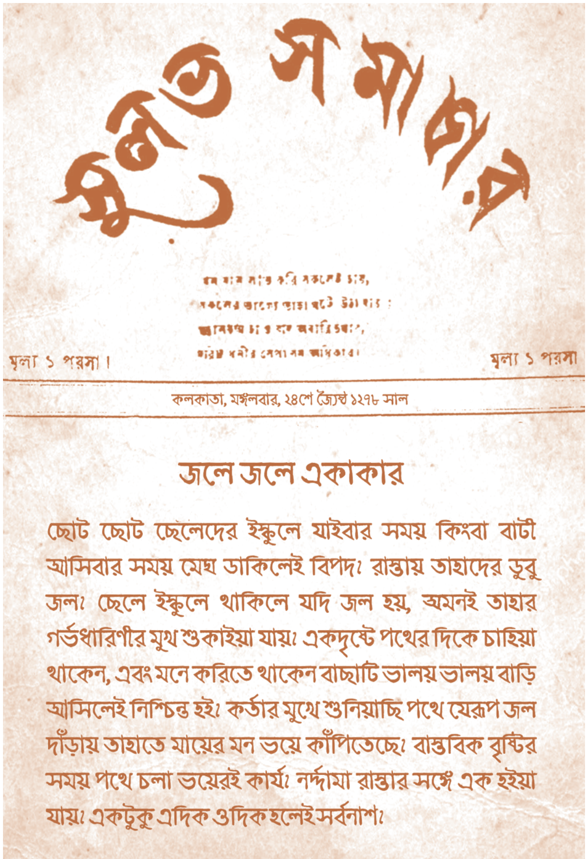
সুলভ সমাচার

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা

কলকাতা, মঙ্গলবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ সাল

জলে জলে একাকার

ছোট ছোট ছেলেদের ইস্কুলে যাইবার সময় কিংবা বাটী আসিবার সময় মেঘ ডাকিলেই বিপদঃ রাস্তায় তাহাদের ডুবু জলঃ ছেলে ইস্কুলে থাকিলে যদি জল হয়, অমনই তাহার গর্ভধারিণীর মুখ শুকাইয়া যায়ঃ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া থাকেন, এবং মনে করিতে থাকেন বাছাটি ভালয় ভালয় বাড়ি আসিলেই নিশ্চিন্ত হইঃ কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছি পথে যেরূপ জল দাঁড়ায় তাহাতে মায়ের মন ভয়ে কাঁপিতেছেঃ বাস্তবিক বৃষ্টির সময় পথে চলা ভয়েরই কার্য্যঃ নর্দ্দামা রাস্তার সঙ্গে এক হইয়া যায়ঃ একটুকু এদিক ওদিক হলেই সর্ব্বনাশঃ

কলিকাতা, মঙ্গলবার, ২১ পৌষ ১২৮২ সাল/৪ জানুয়ারি, ১৮৭৬ (২৭৪ সংখ্যা)।

সূত্র :

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম শারদীয়া ‘ছুটির সুলভ’। অভিজিৎ লাহিড়ী/২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯। বর্তমান।
- শত ধারায় বিকশিত একটি এলাকার ইতিবৃত্ত। সংকর্ষণ মাইতি। মহিষাদল বইমেলা স্মরণিকা/২০২৩।

প্রত্যেক নারী হয়ে উঠুক জীবন্ত দুর্গা

মৌমিতা বর

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।'---দেবী মহাত্মান্

সভ্যতার আদি থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে— শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মানেই মৃত্যু। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে— 'দুর্বলস্য ন কাচিদ্রক্ষা, সর্বে বলিনমাশ্রয়ন্তি।' অর্থাৎ দুর্বলকে কেউ রক্ষা করে না, সকলেই আশ্রয় নেয় শক্তিশালীর। কিন্তু সেই শক্তির প্রকৃত প্রতিমূর্তি কে? ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বারবার উত্তর দিয়েছে— সেই শক্তির জীবন্ত প্রতীক হলেন নারী। তাই শাস্ত্র বলেছে— 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' অর্থাৎ যেখানে নারীর পূজা হয়, সেখানে দেবতাগণ আনন্দে অবস্থান করেন।

আজকের বাস্তবতায় আমরা দেখি— একদিকে নারী মহাকাশ জয় করছেন, দেশরক্ষার সম্মুখসারিতে দাঁড়াচ্ছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে; অন্যদিকে বহু নারী এখনো আত্মবিশ্বাসহীন, অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, কিংবা লিঙ্গবৈষম্য ও সহিংসতার শিকার। ফলস্বরূপ সমাজে ছড়াচ্ছে অন্যায়, অশিক্ষা, অবক্ষয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই সতর্ক করেছিলেন— 'শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু।' নারী যদি তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনতে না পারে, তবে সমাজও শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

নারীর শক্তিই সমগ্র সমাজ, জাতি তথা বিশ্বমানবতার রক্ষাকবচ এরূপ সাক্ষ্য ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস আগেও বারবার দিয়েছে, এখনো দিয়ে চলেছে। ভগিনী নিবেদিতা নারীশিক্ষা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রানি রাসমণি তাঁর মনোবল, অর্থ ও প্রভাবকে ব্যক্তিস্বার্থে নয়, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মানবসেবায় ব্যয় করেছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস প্রভৃতি বীরাঙ্গনা সাহসের প্রতীক হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যকে অস্ত্র বানিয়ে বঞ্চিত সমাজের মুক্তির লড়াই চালিয়েছেন। কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়ামস প্রভৃতি মহাকাশে নারীশক্তির জাগরণের প্রতীক। সুষমা স্বরাজ, কিরণ বেদী, টিনা দাবি, অপরাজিতা রায় প্রমুখ আধুনিক প্রশাসন ও নেতৃত্বে নারীর শক্তির উজ্জ্বল চিত্র। কর্নেল সোফিয়া কুরেশী, উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহ, প্রেরণা দেওস্থালীরা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অদম্য পরাক্রমের প্রতীক।

শক্তি যদি কেবল ভোগ, প্রতিশোধ বা ভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে তা সমাজকে ধ্বংস করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— চরিত্রহীন শক্তি সর্বনাশ ডেকে আনে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— 'শক্তি ছাড়া জীবন নেই, আর ন্যায় ছাড়া শক্তি অন্ধ।' নারীর শক্তি কেবল শারীরিক বা আর্থিক নয়; প্রকৃত শক্তির স্তম্ভ হলো— শীল, ধৈর্য, ক্ষমা, আত্মসংযম, জ্ঞান, সাহস, ন্যায়, সৃজনশীলতা, সেবা, তেজস্বিতা। প্রত্যেক নারীর চরিত্রগঠনের ভিত্তি এই দশটি গুণ, যার সমন্বয়েই নারী হয়ে ওঠেন জীবন্ত দুর্গা। তাঁর দশভুজা রূপ কেবল প্রতীকমাত্র নয়— শীল নারীর চরিত্রকে সুদৃঢ়, পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে। ধৈর্য তাঁকে প্রতিকূলতায় অবিচল রাখে। ক্ষমা নারীকে সহনশীল তথা করুণাময়ী করে তোলে। আত্মসংযম নারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশাসনপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম করে। জ্ঞান তাঁকে আলোকিত, দূরদর্শী ও উদার করে। সাহস অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও পরাক্রমী হতে শক্তি জোগায়। ন্যায় তাকে সত্য ও নীতির সংরক্ষণ করতে শিক্ষা দেয়। সৃজনশীলতা উন্নয়নের দিশা দেয়। সেবা মানবকল্যাণে তথা বিশ্বকল্যাণে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে, আর তেজস্বিতা নারীকে নেতৃত্বের ও কর্মক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

বর্তমান যুগে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সমাজকে নতুন আকার দিচ্ছে, তখন নারীকে হতে হবে আত্মনির্ভর, দক্ষ ও দৃঢ়চরিত্র, যার শুভশক্তিতে সমাজ হবে নিরাপদ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণময়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন— 'যেখানে নারী ভয়হীন, যেখানেই সভ্যতার আলো সর্বাধিক উজ্জ্বল।' রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন— 'নারী, তোমার শক্তি অসীম; তুমি জাগিলে জাগিবে দেশ।' অতএব নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাতে হবে কেবল ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, সৃষ্টির জন্য; কেবল প্রতিযোগিতার জন্য নয়, সহযোগিতার জন্য; কেবল ভয়ের প্রতীক নয়, বরং আশার আলো হবে। আজকের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নারী যদি তাঁর শক্তিকে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করেন, তবে তিনি হয়ে উঠবেন সকল দৈবশক্তির আধার, জীবন্ত দুর্গা--- যিনি সমাজ, জাতি ও বিশ্বমানবতার রক্ষাকবচ। আর তখনই সত্য হবে শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য— 'নারীই হলেন বিশ্বের আত্মশক্তি, তাঁকে জাগ্রত করাই মানবজাতির মুক্তি।'

বিয়ের আগে জরুরি মেডিক্যাল টেস্ট

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

চিকিৎসা পদ্ধতি যতই উন্নত হোক না কেন, আধুনিক স্ট্রেসে ভরা জীবনে মহিলাদের রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমটাই পুরো বদলে গেছে। লাইফস্টাইলের বদল, অত্যধিক ব্রেনওয়ার্ক, ব্যায়াম অনীহা বা সময়ের অভাব— এসবের ফলে তাঁদের স্বাভাবিক ঋতুচক্র প্রভাবিত হচ্ছে। অনেকটা বয়সে গিয়ে তাঁদের বিয়ে হচ্ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে বন্ধ্যাত্ব। আবার এখন বেশিরভাগ মেয়েদের মধ্যে শোনা যায় পলিসিস্টিক ওভারির কথা যে রোগটি বিবাহ-পরবর্তী জীবনে মেয়েদের সন্তান ধারণের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

একই রকমভাবে ছেলেদেরও ভীষণ মানসিক চাপ। কেরিয়ার গড়তে গিয়ে স্ট্রেসফুল লাইফ লিভ করছেন তাঁরা। আইটি সেক্টর হোক বা অন্য সংস্থা, কর্মজীবনের চাপ বদলে দিচ্ছে তাঁদেরও লাইফস্টাইল। যে বয়সে তাঁদের বিয়ে হবার কথা, না হয়ে অনেকটা পরে হচ্ছে। ফলে স্পার্ম কাউন্ট কমে যাচ্ছে। যাকে বলে স্পার্মাটোজেনেসিস। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে ছেলেদেরও শারীরিক ও মানসিক অনেক সমস্যা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তাই বিয়ে হলে সমস্যা আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। এখন বিয়ের আগে হবু বরের স্পার্ম কাউন্ট টেস্টও করাতে চাইছেন অনেক হবু স্ত্রী। এটা ম্যানডেটরি নয় কিন্তু এর গুরুত্ব বাড়ছে। তাই বিয়ে নামক মাহেন্দ্রক্ষণটি সুন্দর করে তুলতে জরুরি হলো সচেতনতা।

বিয়ে ঠিক হবার পরেই পাত্র ও পাত্রী কিছু মেডিক্যাল টেস্ট ও প্রি ম্যারেজ কাউন্সিলিং করলে পরবর্তীকালে হয়তো অনেক গুরুতর সমস্যাকে আটকে দেওয়া সহজ হবে। কী কী পরীক্ষা জরুরি জেনে নিই।

এইচআইভি টেস্ট এবং এসটিডি টেস্ট : এইচআইভি টেস্ট বিয়ের আগে বা অন্য কোনোরকম সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেজ, যেমন গনোরিয়া, সিফিলিস, ওয়ার্টস, ব্যাকটিরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস আছে কি না জানার জন্য এইচআইভি এবং এসটিডি টেস্ট করানো খুবই প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ছেলে বা মেয়েটি যৌনরোগের বাহক হয়। রোগটা শরীরে আছে অথচ কোনো লক্ষণ নেই। ফলে

দু'জনে যদি বাহক হয় তবে সন্তানের মধ্যে সেই রোগ আসবেই।

ফ্যার্টিলিটি টেস্ট : বেশি বয়সে বিয়ে, স্ট্রেসফুল জীবনধারণের ফলে বন্ধ্যাত্ব সমস্যা কিন্তু বাড়ছে। আর এই সমাজে এখনো সন্তানধারণে সমস্যা হলে দোষ দেওয়া হয় মেয়েদেরই। তাই বিয়ের আগে দু'জনেরই ফ্যার্টিলিটি টেস্ট জরুরি। পুরুষের ফ্যার্টিলিটি চেক করার জন্য সিমেন টেস্ট আর মেয়েদের জন্য ওভিউলেশন টেস্ট করানো হয়। আর জননতন্ত্রে কোনোরকম জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না তা দেখার জন্য পেলভিক আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করানো দরকার। তাছাড়াও প্রোল্যাক্টিন, এফএসএইচ, এলএইচ, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন ইত্যাদি হরমোনগুলোর পরীক্ষাও করিয়ে নেওয়া দরকার।

জেনেটিক টেস্ট : জেনেটিক ডিজঅর্ডার কিন্তু এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ছড়ায়। তাই বিয়ের আগে জেনেটিক টেস্ট করা খুবই জরুরি। আর পারলে বিয়ের আগে দুই পরিবারের মেডিক্যাল হিস্ট্রি জেনে নিতে হবে।

ব্লাড গ্রুপ ও কমপ্যাটিবিলিটি টেস্ট : এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা। অনেকেই চায় তার হবু বউ বা বরের ব্লাড গ্রুপ এক হোক, তাহলে তারা একে অপরকে ব্লাড ডোনেট করতে পারবে। সেই সঙ্গে 'আরএইচ ফ্যাক্টর'ও দেখা হয় অর্থাৎ দু'জনের যেন পজিটিভ হয় বা দু'জনেই নেগেটিভ। ও পজিটিভ বা এবি নেগেটিভ যাই হোক না কেন, দু'জনেরই এক হলে ভালো। কারণ এরা ডোনেট বা অঙ্গদানও করতে পারবে প্রয়োজনে। সন্তানের ব্লাড গ্রুপও এক হবে। এখন তো খবরের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে পাত্র বা পাত্রীর ব্লাড গ্রুপ দেওয়া থাকে। এর কারণ এটাই। অর্গান বা টিস্যু ডোনেশনের যুগে এখন চাইলে লিভার, কিডনি, স্কিন, কর্নিয়া সব দান করা যায়। তাই কমন ব্লাড গ্রুপ হলে স্বামী ও স্ত্রী ভবিষ্যতে প্রয়োজনে একে অপরকে এগুলো দিতে পারবে।

ব্লাড ডিজঅর্ডার টেস্ট : এরমধ্যে মূলত তিনটে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রয়েছে--- হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া এবং সিকল সেল অ্যানিমিয়া।

হিমোফিলিয়া : হিমোফিলিয়া হলে রক্ত জমাট বাঁধে না। যে কোনো সময় ব্লিডিং হয়। এই রোগের ক্ষেত্রেও একজন বাহক হন, তাহলে তাঁদের সন্তানেরও এই রোগ হবে।

থ্যালাসেমিয়া : থ্যালাসেমিয়া টেস্ট খুবই জরুরি, কারণ এক্ষেত্রেও বিষয়টা একইরকম। পাত্র বা পাত্রী দু'জনের থ্যালসেমিয়ার বাহক হলে ভবিষ্যতে তাঁদের শিশু কিন্তু একশো শতাংশ থ্যালাসেমিয়া নিয়েই জন্মাবে। ফলে তাঁদের গোটা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোনো একজন বাহক হলে শিশুটি বাহক হতে পারে।

সিকল সেল অ্যানিমিয়া : এটা এক ধরনের জিনগত অসুখ। এই রোগের জন্য বাবা-মা দু'জনেই যদি এই জিনের বাহক হন তবে শিশু এই রোগের শিকার হবে। তাই এক্ষেত্রেও টেস্ট খুব জরুরি। এখন ছোটো-বড়ো সব ল্যাবে এই সব পরীক্ষা করবার সুব্যবস্থা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে প্যাকেজের সুবিধা। প্যাকেজ নিলে খরচ অনেকটা কমে যাবে।

প্রি ম্যারেজ কাউন্সেলিং : এই সবকিছুর শেষে বিয়ের আগে আরও একটা জরুরি বিষয় হলো প্রি-ম্যারেজ কাউন্সেলিং। যে কোনো হবু দম্পতির এটা করা দরকার। ধরে নেওয়া যাক হবু বর অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান করেন কিন্তু বহু মেয়ে যে পরিবেশে বড়ো হয়েছে সেখানে সে এগুলোকে অপরাধ মনে করে। তাহলে সেটাও কিন্তু ভবিষ্যতে বড়ো আকার নিতে পারে। আমরা এগুলো গুরুত্ব দিই না। প্রি ম্যারেজ কাউন্সেলিং অনেক সংসার সহজ সমাধান।

শ্রীভূমিতে সংস্কৃত সপ্তাহের সমারোহ অনুষ্ঠান

বিভাস চন্দ্র দাস ।। সংস্কৃত ভারতী শ্রীভূমি জেলা সমিতির উদ্যোগে গত ২১ আগস্ট দক্ষিণ অসম প্রান্তের শ্রীভূমিতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে সংস্কৃত সপ্তাহ সমারোহ সম্পন্ন হয়। শ্রীভূমি সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের অরবিন্দ রায় স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণ অসম প্রান্ত অধ্যক্ষ তপোময় ভট্টাচার্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শ্রীভূমি জেলা সঙ্ঘচালক নর্মদা চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন বিভাগ সংযোজিকা ড. গীতা সাহা, জেলা সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী, সহ সভানেত্রী পূরবী দে, মলয়কান্তি চৌধুরী, নেপালকৃষ্ণ ধর, সুব্রত চৌধুরী, বনানী চৌধুরী, মৌসুমী রায়, শান্তা চৌধুরী, রূপশ্রী দাস চৌধুরী, ঝুমা দাস। সংস্কৃত ভারতীর কর্মকর্তা অনুপ শর্মা ও বিনয় চক্রবর্তীর কণ্ঠে ধ্যেয়মন্ত্র উচ্চারণ করার পর মঞ্চস্থ অতিথিদের উত্তরীয়, চন্দনের ফোঁটা এবং উপহার সামগ্রী দিয়ে বরণ করার পর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মৌমিতা দেব পুরকায়স্থ ও সোনালী গোস্বামী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রান্ত অধ্যক্ষ শ্রীভট্টাচার্য বলেন, সংস্কৃত ভাষাকে সর্বস্তরে প্রচার ও প্রসার করার লক্ষ্যে জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে চলেছে সংস্কৃত ভারতী। বিশ্বের অন্যতম এই প্রাচীন ভাষাকে আয়ত্ত করতে খুব কষ্ট করতে হয় না। ভারতের গৌরবময় ইতিহাস জানতে হলে সংস্কৃতভাষা অবশ্যই জানা উচিত। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে। সংস্কৃত ছাড়া সংগীত ও নৃত্য কল্পনা করা যায় না। সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তা খুব সহজেই বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি সংস্কৃত ভারতীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জেলা সভাপতি শ্রীচক্রবর্তী বলেন, বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়। সংস্কৃতকে কম্পিউটার উপযোগী ভাষা বলা হয়। জনগণনার সময় নিজের মাতৃভাষার পরেই সংস্কৃতের কথা বলতে হবে। জেলা সঙ্ঘচালক নর্মদা চক্রবর্তী বলেন, সংস্কৃত খুবই সহজ ও সুন্দর ভাষা। সংস্কৃতকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে সংস্কৃত ভারতী যে নিরলস প্রয়াস করে চলেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সোনালী গোস্বামীর পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এছাড়া পুষ্পাঞ্জলি দাশ পুরকায়স্থের পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যাঞ্জলি ডান্স অ্যাকাডেমির শিল্পীরা। পায়েল চক্রবর্তী কুরি পরিচালিত নূপুর নৃত্যালয়ের শিল্পীদের নৃত্য সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয়। বন্দে মাতরম সংগীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করেন গীতবিতান সংস্থার শিল্পীরা। শেষ নৃত্য পরিবেশন করেন জয়শ্রী দেব পরিচালিত নৃত্য-কলা ক্ষেত্রের শিল্পীরা। একক সংগীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী সোনালী গোস্বামী। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিল্পীদের শংসাপত্র প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। কল্যাণ মন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে 'আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের গর্ব' সংকল্প অভিযান

বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষার অভিমুখকে সুনির্দিষ্ট করতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয়

শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, বিদ্যালয় শিক্ষা গত ১ সেপ্টেম্বর রাজ্যের পাঁচহাজারের বেশি বিদ্যালয়ে 'আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের গর্ব' কর্মসূচির আয়োজন করে। এই অভিযানটির বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি 'আমার বিদ্যালয়, আমার তীর্থ'-এর অংশ। যার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত অগ্রগতি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং বৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করা। এই ঐতিহাসিক কর্মসূচি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কোটি কোটি শিক্ষার্থী এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা একত্রিত হয়ে পাঁচটি সংকল্প পাঠ করেন। এই সংকল্পগুলি নিজের বিদ্যালয়ের প্রতি গর্ব, সামাজিক উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার, ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য এবং দেশের প্রতি কর্তব্যের বিষয়ে সকলকে স্মরণ করাবে। এটি একটি শিক্ষক সংগঠন কর্তৃক শুরু করা এই ধরনের প্রথম বিশ্বব্যাপী অভিযান। এই কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরে মহাসঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি আশিস মণ্ডল বলেন, আজ এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো রাজ্যের চার হাজার বিদ্যালয়ের পাঁচ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতে একই দিনে পাঁচ লক্ষ বিদ্যালয়ে এই অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আমাদের সংকল্প গ্রহণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়গুলি দেশের গর্ব, সংস্কৃতি ও জাতিগঠনের কেন্দ্র হয়ে উঠুক। আমাদের এই কর্মসূচি ভারতের সমৃদ্ধ শিক্ষাগত ঐতিহ্যের একটি শক্তিশালী প্রদর্শনী হিসেবেও কাজ করবে, যেখানে বিদ্যালয়গুলিকে কেবল শিক্ষার স্থান নয়. বরং সম্মিলিত গর্ব ও দায়িত্বের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের চারহাজার বিদ্যালয়-সহ সারা ভারতের পাঁচলক্ষের বেশি বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অংশগ্রহণে এই অভিযান স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম শিক্ষামূলক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি শ্রীভূমি শাখার ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিভাস চন্দ্র দাস।। গত ১৭ আগস্ট সন্ধ্যায় অসমের শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি শ্রীভূমি শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের প্রেক্ষাগৃহে ঋষি অরবিন্দের ১৫৩ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য সমিতির পূর্বতন সহ সভাপতি তথা এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মানস ভট্টাচার্য, শ্রীভূমি জেলা সমিতির পূর্বতন সম্পাদক ড. সুধীর চক্রবর্তী এবং পূর্বতন সভাপতি মৃন্ময় রায়।

মঞ্চস্থ অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্বলন ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণের পর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়াঙ্কা দাস চৌধুরী। বক্তারা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্মের উপরে আলোকপাত করেন। সমিতির সভাপতি নেপাল কৃষ্ণ ধরের ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পূবালী দাশ পুরকায়স্থ।

পূর্বাঞ্চল জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্বাস্থ্য ও ফিজিয়োথেরাপি কেন্দ্রের উদ্বোধন

পূর্বাঞ্চল জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট কলকাতার গোবিন্দপুরে PJKS Health & Physio Care ফিজিয়োথেরাপি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হলো। এই সেন্টারের মূল লক্ষ্য হলো যোগ্য ও অভিজ্ঞ ফিজিয়োথেরাপিস্টদের দ্বারা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এলাকার গরিব মানুষদের কাছে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে সর্বপ্রকার ফিজিয়োথেরাপি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ফিজিয়োথেরাপি ছাড়াও নামমাত্র খরচে কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের পরামর্শ পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আগামীতে গরিব রোগীদের জন্য হুইলচেয়ার, হাসপাতালের বেড, ওয়াকার, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্বল্প ভাড়ায় দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমিতির কোষাধ্যক্ষ ললিত তোদি বলেন, আজকের জীবনচর্যা, খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশ দূষণের কারণে সমাজের প্রায় প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ফিজিয়োথেরাপি অপরিহার্য। অথচ এই পরিষেবা সহজলভ্য নয় এবং গরিব মানুষদের সাধ্যের মধ্যেও নেই। PJKS Health & Physio Care সেই শূন্যস্থান পূরণে বিশেষ ভূমিকা নেবে। তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার, প্রাইভেট সেক্টর ও সামাজিক সংগঠনকে একসঙ্গে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ভারত এক সক্ষম ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। এই পুণ্যকাজ PJKS Health & Physio Care সেন্টারের মাধ্যমে সমিতির এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রসার বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তকার্যালয় শিলিগুড়ি-স্থিত ভারতমাতা মন্দিরে গত ৩০, ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় প্রান্ত প্রচার প্রসার বর্গ। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সামাজিক মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া) প্রমুখ রাকেশ পাণ্ডে। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্গের শুভারম্ভ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও গুয়াহাটি ক্ষেত্রের পালক তথা প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল এবং প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনুপ কুমার মণ্ডল। শিলিগুড়ি নগর-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ২২ জন প্রতিনিধি বর্গে অংশগ্রহণ করেন। সাংগঠনিক দৃষ্টিতে প্রচার বিভাগের ভূমিকা এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয় ছাড়াও প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোকপাতে প্রতিনিধিদের সমৃদ্ধ করেন শ্রীপাণ্ডে। বিমর্শ (ন্যারেটিভ) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-প্রান্ত মন্ত্রী তথা প্রান্ত প্রচার প্রমুখ লোকেশ্বর মোহন্ত ভারত তথা বিশ্বব্যাপী হিন্দুত্ব বিরোধী ন্যারেটিভের তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যায় প্রতিনিধিদের সজাগ ও সচেতন করেন। বর্গের দ্বিতীয় দিনে বর্তমান সময়ে প্রচার বিভাগের গুরুত্ব বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধিদের আলোকিত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি বিভাগ কার্যবাহ ডাঃ বিশ্বপ্রতীম রুদ্র। বাংলা স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক মানস বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ্ঞ আলোচনার মাধ্যমে বর্গের শ্রীবৃদ্ধি করেন। বর্গের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শিলিগুড়ি জেলা সোশ্যাল মিডিয়া প্রমুখ মোহনলাল কেশরী এবং জেলা প্রচার প্রমুখ যোগেশ আগরওয়াল।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে গোবরডাঙ্গায় গৌড়ীয় নৃত্য কর্মশালা

গত ২৭ আগস্ট সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে, ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় এবং সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যবস্থাপনায় গোবরডাঙ্গার বাবুপাড়ায় সৃজনী নৃত্যাঙ্গনে দুদিনের গৌড়ীয় নৃত্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়, গৌড়ীয় নৃত্যধারার সংগীত গবেষক পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর বরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা। এরপর ভারত সরকার প্রদত্ত শংসাপত্র সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি অমিত দে।

মঞ্চস্থ অতিথিবর্গ নটরাজ প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন দীপমন্ত্র সহযোগে। পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৯জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা গৌড়ীয় নৃত্য পরিবেশন করেন সর্বসমক্ষে।

গুজরাটের সুরাট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে শ্রীশ্রী গণপতি পূজা

গুজরাট রাজ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সুরাট শাখায় গত ২৭ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর মহা ধুমধামে শ্রীশ্রীগণেশপূজা সম্পন্ন হয়। পূজা উপলক্ষ্যে দশদিন ধরে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলা, চিত্র আঁকা, গীতাপাঠ, নাচ, গান, বক্তৃতা, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি প্রতিযেগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও কবি সম্মেলন, ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। ৫ সেপ্টেম্বর শান্তিযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। সব অনুষ্ঠানেই স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ, স্বামী বোধমিত্রানন্দ, স্বামী বীরভদ্রানন্দ, স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ, স্বামী দেবরূপানন্দ, স্বামী নর্মদানন্দ, স্বামী নীলাম্বরানন্দ,-সহ বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যোগদান করেন। বহু স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে আশ্রম পরিসর আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। পুরো অনুষ্ঠান স্বামী অম্বরীশানন্দ মহারাজের পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের বলরাম পূজন উৎসব

গত ২৯ আগস্ট, ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে মালদহ জেলার গাজোলে সঙ্ঘ কার্যালয়ে সাড়ম্বরে পালিত হলো কৃষকদের পরমারাধ্য ভগবান, হলধর শ্রীবলরামের পূজা। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। কৃষক দেবতা শ্রীবলরামের পূজায় ভোগ নিবেদন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল প্রখণ্ডের সম্পাদক অনুপম গোস্বামী। তারপর উপস্থিত সকল ভক্তরা শ্রীভগবানের চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই উৎসবে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলার সহ-সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত টোলীর সদস্য নিখিলচন্দ্র মজুমদার, প্রখণ্ড সভাপতি মানবেন্দ্র সরকার, সঙ্ঘের জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ শচীন রায়, সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ দিলীপ সরকার, খণ্ড কার্যবাহ বিপুলবন্ধু বাগচী-সহ আরও অনেকে। পূজা শেষে সকলকে প্রসাদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়।

নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

প্রতি বছরের মতো এবারও নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে সাফল্য লাভ করেছে, তাঁদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। গত ৩০ আগস্ট ২০২৫-এ সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্রজীবনে তাঁদের সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তাঁরা হলেন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁদেরও সম্মানিত করা হয়। দীপ বন্দনা ও স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীদিনের পথপ্রদর্শন করান খড়্গাপুর আইআইটি-র সমুদ্র, নদী, আবহাওয়া ও ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক ও 'ছাত্র উৎকর্ষতা'র বিভাগীয় ডিন ড. অরুণ চক্রবর্তী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক অঞ্জলি সিনহা, মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী ট্রাস্টের সভাপতি মৃগাঙ্কশেখর মাইতি-সহ অনেক বিশিষ্টজন। তাঁদের আশীর্বাণী ছাত্র- ছাত্রী-সহ উপস্থিত সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। সকল বক্তার কথায় উঠে আসে সুন্দর-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার ডাক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন নরেন হালদার। নিবেদিতা মন্দিরের আচার্যাদের এবং বিদ্যালয়ের সভানেত্রী ও সম্পাদকের সক্রিয় সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি এদিন আয়োজিত হয়। এছাড়াও সংস্কার ভারতীর মেদিনীপুর শহরের সদস্য ও সদস্যারা বাড়িয়ে দেন তাঁদের সহযোগিতার হাত। ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের হাতে একটি করে স্মারক এবং 'তরুণের স্বপ্ন' বইটি উপহারস্বরূপ তুলে দেওয়া হয়। মণিশঙ্কর সেনাপতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

হাওড়ার বাগনানে লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের কর্মশালা

গত ২৯, ৩০, ৩১ আগস্ট সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে হাওড়া জেলার বাগনান হিন্দু মিলন মন্দির ও সরস্বতী আশ্রমে লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৬ জন কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের মাতৃশক্তি প্রমুখ মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, খ্যাতিমান শিল্পী ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য, প্রদেশ সংগীত টোলির সদস্যা অনিমা দাস মজুমদার ও তনুশ্রী মল্লিক। এছাড়াও বাগনান হিন্দু মিলন মন্দির ও সরস্বতী আশ্রমের সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী, আমতা ব্লকের বিডিও সাহেব এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফটিক চক্রবর্তী। কর্মশালার সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার সাহিত্য কলা বিধা প্রমুখ ডাঃ অর্পণ চৌধুরী। প্রথমেই অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চন্দনের ফোঁটা ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। দীপমন্ত্র সহযোগে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। হওড়া গ্রামীণ জেলার সহ সভাপতি দিব্যেন্দু চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট অতিথিগণ ভারতমাতার প্রতিকৃতি, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি ও নটরাজ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

সংস্কার ভারতীর হাওড়া জেলার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সংগঠনের ভাবসংগীত। তারপর উপস্থিত অতিথিগণ সংগীত বিষয়ক বক্তব্য রাখেন। তাঁরা শিশুর মানসিক, শারীরিক ও নান্দনিক বিকাশে শাস্ত্রীয় সংগীতের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন।

কর্মশালায় সংগীতের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, তাল-লয়-ছন্দ সুচারুরূপে অবহিত করেন সংগীত প্রশিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য। হাওড়া গ্রামীণ জেলার সম্পাদক স্বরূপ মিত্র তবলায় সঙ্গত করেন। আরও দুজন তবলাবাদক উত্তম সরকার ও অংশুমান ভৌমিক সহযোগী ছিলেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রশিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্যের কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক তত্ত্বাবধানে কর্মশালাটি এক সুন্দর মাত্রা পায়। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা একটি জমকালো সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁরা পুষ্পস্তবক, মিষ্টি এবং নানা প্রকার উপহার প্রিয় প্রশিক্ষকের হাতে তুলে দেন। বক্তব্য রাখেন চঞ্চল চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী ও তনুশ্রী মল্লিক।

সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০ ও ৩১ আগস্ট সংস্কার ভারতী, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো বালুরঘাট সরস্বতী শিশুমন্দিরে। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তারা দু'দিন ব্যাপী এই সভায় উপস্থিত হয়ে অতিগভীরভাবে পরস্পর মতবিনিময় করেন এবং সংগঠনের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য কার্যকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা পূর্বাঞ্চলের প্রভারী ধনঞ্জয় কুশরে, সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ অধীর নীলকণ্ঠ রায়, সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ড. তামস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত সম্পাদক কিশোর কুমার সরকার, কোষাধ্যক্ষ জয়নারায়ণ রায়চৌধুরী এবং সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। উত্তরবঙ্গের সাতটি স্থান থেকে মোট ৪৫ জন কার্যকর্তা এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গে সংগঠনের বর্তমান স্থিতি তুলে ধরেন প্রান্ত সম্পাদক। উত্তরবঙ্গের মোট জেলা ৯টি। তার মধ্যে সংস্কার ভারতীর কাজ প্রসারিত হয়েছে ৭টি জেলায় এবং একটি মহানগরে (শিলিগুড়িতে)। চর্চাকেন্দ্র রয়েছে ২২টি স্থানে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামীদিনে আরও ৫টি চর্চাকেন্দ্র বাড়ানো হবে। এছাড়াও কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ শিবির, মুখপত্র প্রকাশ, সদস্যপদ বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে লোককলা কর্মশালা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাট্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষে ধনঞ্জয় কুষরেজীর সমাপ্তি ভাষণ হয় এবং রাষ্ট্র বন্দনা গাওয়ার মধ্য দিয়ে এই সভা সমাপ্ত হয়।

ঈশ্বরপুরে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের প্রান্ত অধিবেশন

গত ৩০,৩১ আগস্ট ঈশ্বরপুর (ইসলামপুর) মাহেশ্বরী ভবনে উত্তরবঙ্গ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের প্রান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক মুরলীধর বিন্দা,সহ সংযোজক শ্রীরামকুমার মিশ্র, পূর্বক্ষেত্র সংযোজক গণেশ পাল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য সাধন কুমার পাল প্রমুখ। অধিবেশনে উত্তরবঙ্গে ৮টি জেলা থেকে ১২০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে সাধন কুমার পাল বলেন, আমরা চিকেন নেক বাংলাদেশ ও নেপালের মাঝখানে ঈশ্বরপুরে ঐতিহাসিক অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। এই সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর কাজ চলছে। এটাকে বাঙ্গালি বিতাড়ন চলছে বলে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল ও কমিউনিস্টরা গলা ফাটাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে এই রাজ্যকে ইসলামি দেশ বানানোর পরিকল্পনা করছেন। এই থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ জামাতি ইসলামের লোকজন কোচবিহারের তিনবিঘাতে জমায়েত হয়েছিল দহগ্রাম যাওয়ার জন্য। বিএসএফ তাদের আটকে দেয়। শ্রীরামকুমার মিশ্র বলেন, কেবল বিএসএফ সীমা সুরক্ষা করবে তা নয়, জনসাধারণকেও চিন্তা করতে হবে। একইভাবে ওড়িশা সমুদ্র সীমা দিয়েও রোহিঙ্গা মুসলমানরা ঢুকছে রুজি রোজগারের আশায় নয়, পাকিস্তান তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে।

পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল বলেন, আগামী বিজয়াদশমীতে সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্ণ হবে, সীমান্ত চেতনা মঞ্চের কার্যকর্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসম্পর্ক এবং খণ্ডে খণ্ডে হিন্দু সম্মেলন করতে হবে।

শ্রী মুরলীধর বিন্দা বলেন, সীমা জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তাদের বিবেক বুদ্ধির সঙ্গে দেশভক্তি ও সমর্পণের ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। সীমান্ত সুরক্ষিত না থাকলে বাংলাদেশি জেহাদিরা অনুপ্রবেশ করে দেশের শান্তি ভঙ্গ করবে। দেশ আমাদের ,তাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সীমান্তের গ্রামে গ্রামে, স্কুলে স্কুলে দেশভক্তির গান শেখাতে হবে। শেষে জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর সংগঠনের পতাকা অবতরণ করে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

গাজোলে অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে মাতৃসম্মেলন

অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে মালদহ জেলার গাজোল থানার সাতমাইল গ্রামের হিন্দু মিলন মন্দিরে গত ৫ সেপ্টেম্বর পুণ্যশ্লোক রানি অহল্যাবাঈ হোলকরের তিনশো বছর জন্মশতাব্দী উপলেক্ষ্যে এক মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সহ সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার, বিভাগ সংগঠন সম্পাদক সুশীল চৌধুরী, জেলা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী, জেলা যুব প্রমুখ জয়জিৎ সরকার, জেলা জৈব সার প্রমুখ রঞ্জিত কর্মকার, গ্রাম সমিতির মাতৃ প্রমুখ কবিতা মণ্ডল। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সহ সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। এরপর সকলে একে-একে অহল্যাবাঈ হোলকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। পরেশচন্দ্র সরকার অহল্যাবাঈ হোলকরের প্রেরণাদায়ী জীবনগাথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। কিষাণ সঙ্ঘের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। সম্মেলনে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন ভূষণ সরকার, জয়জিৎ সরকার এবং পার্থ চক্রবর্তী।

দুর্গাপুরের গড়জঙ্গলে মেধস মুনির আশ্রম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

তখন সত্যযুগ। রাজ্যভ্রষ্ট এক রাজা, নাম তাঁর সুরথ। একই সঙ্গে সম্পদ হারানো এক বণিক বৈশ্য সমাজ। দু'জনেই স্বজন স্বজাতিদের ছেড়ে অরণ্যচারী। প্রায় একই সময়। তবে তাঁরা বিচরণ করছিলেন বনের দুই ভিন্ন প্রান্তে।

এক সময় কিন্তু দুই প্রান্ত মিলন একই বিন্দুতে, মুখোমুখি দু'জন। শুরু কথাবার্তা। তারপর দুজনেই বুঝলেন, তাঁরা ভাগ্যাহত। নিয়তি তাঁদের বাধ্য করেছে অরণ্যবাসী হতে। সব হারানোর দুঃখে তখন দু'জনেই নিমজ্জিত। অথচ আশ্চর্য, তারও মধ্যে তাঁরা ভাবছেন তাঁদের সেই হারানো মানুষজনের কথা। ভালো আছে তো সকলে! কোনো বিপদ হয়নি তো তাদের? তাঁদের অভাবে সেই মানুষগুলি করে খাচ্ছে না তো কারও কাছে!

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু উত্তর মেলে না। সে কারণেই বিভ্রান্ত তাঁরা। এবার যুগলে ধরলেন একই পথ। চলতে চলতে পৌঁছলেন এক তপোবনে। মহর্ষি মেধস মুনির আশ্রমে। সেই পুণ্যভূমিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতমাখা এক ধরনের প্রশান্তি তাঁদের গতিতে আনল যতি। তাঁরা বিনম্র চিত্তে প্রণাম করেন ঋষি মেধসকে। জানান তাঁদের দুঃখের কথা। সেই সঙ্গে প্রশ্ন, কেন এমন হয়? কেন তাঁদের কথাই ভাবছেন অনুক্ষণ, যাঁরা প্রতারণা করেছেন, বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন, বঞ্চিত করেছেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে। কেন ভাবছেন তাঁদেরই কথা?

স্মিত হাস্যে বলেন মহর্ষি মেধস, এ সবই মায়া। এসবই মহামায়ার লীলা। তাঁরই ইঙ্গিতে হয় সব— তিনিই আদি, তিনিই একমাত্র সত্য। তিনি যদি কৃপা করেন, তাহলে শত অসম্ভবও হয় সম্ভব।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির প্রশ্নের উত্তরে মেধস মুনি তাঁদের বলেন, সেই মা— সেই দেবী— সেই আদ্যাশক্তির কথা। তারপর তাঁরই স্মরণ নিতে বলেন তিনি। বলেন তাঁর অর্চনার প্রণালী।

মেধস মুনির নির্দেশ মতোই আশ্রম সন্নিহিত নদীতীরে দেবী প্রতিমা গড়ে শুদ্ধ মনে নিষ্ঠাভরে তাঁরা পূজা করেন চৈত্রমাসে শুক্লা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। তপস্বীর কঠোর জীবনযাপন করে পরপর তিন বছর তাঁরা পূজা করেন দেবীর। সেটাই পৃথিবীতে প্রথম দুর্গাপূজা। পূজাক্ষেত্র মেধস মুনির আশ্রম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, দেবী পুরাণ, কালিকা পুরাণ ইত্যাদিতে রয়েছে এসব কথা। আছে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্যেও। বেদ ও বেদাঙ্গেও উল্লেখ রয়েছে দেবী দুর্গার উল্লেখ। পরবর্তীকালে হরপ্পা সভ্যতার যেসব নিদর্শন উদ্ধার করা গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পর, সেখানেও মিলেছে এমন সব নারীমূর্তি যা মহিষাসুরমর্দিনী বা দেবী মহামায়ার মূর্তি বলেই মনে করা হয়। তার থেকে সিদ্ধান্ত, যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে দেবী দুর্গার এই পূজা।

এসবই সেই নিত্যাদেবীর নিত্যদিনের কথা। কিন্তু একি কেবলই পুরাণ কথা? কোথাকার রাজা ছিলেন সুরথ? কোন জঙ্গলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বৈশ্য সমাধির? কোথায়-বা ছিল মেধস মুনির

আশ্রম আর কোথায় হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম দুর্গাপূজা?

এর উত্তর পাওয়া যায় লোকশ্রুতিতে। জন বিশ্বাসে। লোককথা, পূর্ব বর্ধমানের দুর্গাপুরের অদূরে কাঁকসা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের গড় জঙ্গলেই ছিল সত্যযুগের সেই মেধস মুনির আশ্রম। এখানেই চৈত্রের শুক্লপক্ষে দেবী দুর্গার পূজা করেন রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি। সেই পূজা এখন বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত।

এই পূজা করে রাজা সুরথ ফিরে পান তাঁর রাজ্য। তারপর মেধসের এই আশ্রম অঞ্চল বা গড় জঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করেন মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর তিনটি মন্দির। পরে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় মহাকাল ভৈরবের মন্দির। শোনা যায়, এইখানে ছিল ষোলোটি মন্দির। তবে এখন রয়েছে মাত্র দুটি মন্দির— শ্যামরূপা কালী মন্দির এবং শিব মন্দির।

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এই শ্যামরূপা মন্দির সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতেই পারে। এসব কথার কেন্দ্রে যাঁরা, তাঁরা ঐতিহাসিক পুরুষ। কিন্তু তথ্যগুলি সবই যে ঐতিহাসিক সত্য, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ওইসব তথ্যের বেশিরভাগই লোকশ্রুতিমূলক। বলা হয় বঙ্গদেশে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের মুখে লক্ষ্মণসেন রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু কোথায় যান তিনি? এ সম্পর্কে রয়েছে নানা মত।

লোকবিশ্বাস ও জনকথন, লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গড়জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এখানে তিনি নাকি দুর্গাপূজাও করেন। ওইসময়ে গড়জঙ্গল এলাকায় ছিল শাক্ত কাপালিকদের প্রবল প্রভাব। এই কাপালিকরা পূজায় নরবলিও দিতেন। এইরকমই এক কাপালিক শ্যামল কাপালিক। ইনি নাকি ছিলেন একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক। লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণব হলেও এই কাপালিকের ভক্ত হয়ে পড়েন। শ্যামল কাপালিক তাঁকে মায়ের একটি মন্দির তৈরি করে দেবার জন্য অনুরোধ জানান।

মনের দিক থেকে তেমন সায় না থাকলেও লক্ষ্মণসেন মন্দির তৈরির ব্যবস্থা করে দেন। অজয় নদের তীরে তৈরি মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় কালীমূর্তি। শ্যামল কাপালিক দেবীর পূজায় নরবলি দেবার উদ্যোগ নেন।

লক্ষ্মণসেন এটা আর মেনে নিতে পারেন না। সভাকবি জয়দেবকে এর একটা প্রতিকার করার জন্য অনুরোধ জানান তিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে অন্য এক জনশ্রুতি, জয়দেব নিজের থেকেই এই নরবলি বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন।

কাহিনি, জয়দেব মন্দিরে এসে শ্যামল কাপালিককে নরবলি বন্ধের জন্য নানাভাবে বোঝাতে থাকেন। কাপালিক কিন্তু কোনো কথাতেই কান দেন না। তিনি নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। সে অবস্থায় জয়দেব বলেন, কাপালিক যদি তাঁর সাধনার দ্বারা দেবী প্রতিমাকে জাগ্রত করতে পারেন এবং দেবী যদি নরবলি চান বলে জানান, তাহলে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না।

কাপালিক পূজা শুরু করেন। পূজা এবং দীর্ঘ প্রার্থনাতেও দেবী জাগ্রত হলেন না। এরপর জয়দেব সুললিত পদে তাঁর আরাধ্যের স্তব করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই শ্যাম রূপে আবিভূতা হন দেবী। সব দেখে কাপালিক বিস্মিত। ভীত ও প্রণত। নরবলি বন্ধ করেন তিনি। প্রতিমা শ্যামরূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণে নাম হয় তার শ্যামরূপা। অন্য লোকমুখে এই শ্যামরূপা হয়ে যান শ্যামারূপা।

কিংবদন্তি, মেধস মুনির ওই আশ্রমে প্রথম দুর্গাপূজা করেন রাজা সুরথ। এই পূজার পর তিনি আবার রাজ্য ফিরে পান। আবার রাজধানী স্বপুর বা সপুরে বসবাস করতে থাকেন।

বোলপুর শহর থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে অজয়ের তীরে অবস্থিত সুপুর গ্রামটিই সেদিনের সপুর। কেউ কেউ বলেন, অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল স্বপুর বা সুবাহুপুর। এক সময়ের লাড় দেশে (বর্তমান রাঢ় বাংলা) রাজা সুবাহু সিংহের নাম অনুযায়ী এই জনপদটির নাম হয় সুবাহুপুর। পরবর্তীকালে এই সুবাহুপুরেই আশ্রয় নেন রাজা সুরথ।

জনশ্রুতি, রাজ্য ফিরে পাবার পর রাজা সুরথ ভগবতীর আরাধনার জন্য সুপুরের লৌকিক দেবী শিবিক্ষার উদ্দেশে এক লক্ষ ছাগ বলি দেন। বলা হয়, কেবল এক জায়গায় নয়, তিনি সুপুরের বাঘলা পুকুরের পাশে গড়ে ওঠা শিবিক্ষার মন্দির থেকে শুরু করে রজতপুরের মহামায়া মন্দির হয়ে বোলপুরের ডাঙ্গালি কালীতলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই পশুবলি দেন। বলির রক্তে তখন একরকম বান ডেকেছিল। এই বলির পরই ডাঙ্গালি কালীতলা এবং তার আশপাশের নাম হয় বলিপুর। কালক্রমে এই বলিপুরই হয় প্রসিদ্ধনামা বোলপুর।

বর্তমান বোলপুর-ইলামবাজার সড়কের পাশেই ছিল রাজা সুরথের নামে প্রতিষ্ঠিত সুরথেশ্বর শিবমন্দির। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে গমগম করত এই অঞ্চল। কিন্তু কালের নিয়মেই একসময় সব যেন হারিয়ে যায়। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে এই শিবমন্দির। জনস্মৃতি থেকেই মুছে যায় সব। কিন্তু স্মৃতি তো হারায় না চিরতরে। আর সে কারণেই প্রায় শতবর্ষ আগে গজপতিনাগ নামে এক শৈব সাধু এসে মন্দিরটি খুঁজে বের করেন। খানিকটা সংস্কারও করেন তিনি মন্দিরের। এরপর রাইপুরের জমিদার বংশের প্রমথনাথ সিংহের স্মৃতিরক্ষায় তাঁর স্ত্রী সুভাষিণী দেবী সুরমেশ্বর মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করে দেন ১৩৩৯ সালে।

রাজা সুরথের এই শিব মন্দিরের মতোই মেধস মুনির আশ্রমটিও এক সময় অশ্বত্থ পাকুড় গাছের তলায় চাপা পড়ে যায়। গভীর জঙ্গলে ভরে ওঠে নানা শ্বাপদ প্রাণীতে। ক্রমে এই আশ্রমের কথা ভুলেই যায় মানুষ।

সময় বয়ে যায়। সেটা বিংশ শতাব্দীর একাধারে শেষ দশকের কথা। বোলপুরে আশ্রম তৈরি করেন দশনামী সম্প্রদায়ের এক সাধু। নাম তাঁর যোগীরাজ ব্রহ্মানন্দ গিরি।

বাংলা ১৩৯৮ সাল। ইংরেজির ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। ব্রহ্মানন্দজীর আশ্রম ক্রমে ভক্ত সমাগমে গমগম করতে থাকে। বীরভূম, বর্ধমান থেকে আসা ভক্তের ভিড়ে ভরে ওঠে আশ্রম। তারই মধ্যে একদিন

ধ্যানমুহূর্তে ব্রহ্মানন্দজীর হৃদয়পাশে ভেসে ওঠে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক তপোভূমির ছবি— এক আশ্রম তাঁকে যেন অস্থির ভাবে ডাকছে।

ব্রহ্মানন্দজী ভক্তদের জানান তাঁর ধ্যানদৃশ্যের কথা। শুরু হয় ধ্যানে ভেসে ওঠা জঙ্গলে আশ্রমের সন্ধান। তারই মধ্যে একদিন 'বীরভূমের ইতিহাস' বই থেকে জানতে পারেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক নদীতীরে একসময় ছিল এক আশ্রম ও মন্দির।

সেই সূত্রধরে শুরু হয় অনুসন্ধান। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আসেন গড়জঙ্গলে। অবশেষে এক টিলার উপরে অশ্বত্থ পাকুড় গাছের শিকড়ে মোড়া এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান তিনি তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। খনন কাজ চলতে থাকে। পাওয়া যায় লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, চণ্ডী মন্দির এবং একটি শিবমন্দিরের সন্ধান। পুরাণ ও নানা শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন এটিই মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত মেধস মুনির সেই আশ্রম। এখানেই রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি করেছিলেন পৃথিবীর প্রথম দুর্গাপূজা।

গড় জঙ্গলে আবিষ্কৃত মেধস মুনির ওই আশ্রমটি এখন গড় চণ্ডীধাম নামে পরিচিত। এটি এখন কেবল বীরভূম, বর্ধমান নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গেরই একটি পবিত্র তীর্থভূমি হয়ে উঠেছে। বছরের প্রায় সারা সময়ই হয় ভক্ত ও পর্যটকদের সমাগম। দুর্গাপূজার সময় তো গড় চণ্ডীধামে নামে মানুষের ঢল। কয়েক হাজার মানুষ আসেন তখন আশ্রমের দেবী মূর্তি দর্শনে এবং মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য।

লোকশ্রুতির সূত্রেই এই গড় জঙ্গলে মেধস মুনির আশ্রম আজ হয়ে উঠেছে বহুজনের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদনের এক মহা পূণ্যভূমি।

দাবিদার চট্টগ্রামও

রাঢ় বঙ্গের গড় জঙ্গলের এই মেধস মুনির আশ্রমের মতোই বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বোয়ালখালি উপজেলার সীমান্তবর্তী করলডেঙ্গা পাহাড়ের চূড়াতেও রয়েছে মেধস মুনির এক আশ্রম। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বেদানন্দ নামে সন্ন্যাসী যোগবলে এই আশ্রমের কথা জানতে পারেন। তাঁরই উদ্যোগে উদ্ধার হয় এই লুপ্ততীর্থের আশ্রম এবং কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

গৌরীতন্ত্রের কামাখ্যাতন্ত্রে আছে, কর্ণফুলি মহানদীর তীরের পর্বতে রয়েছে মার্কণ্ডেয় মুনি কথিত মেধস মুনির সেই পুণ্য আশ্রম। বেদানন্দ স্বামী এসব বচন উদ্ধৃত করে বলেন, এই আশ্রমে শাস্ত্রে বর্ণিত সব চিহ্নই আজও রয়েছে যথাযথ ভাবেই।

স্বামী বেদানন্দ যখন এই আশ্রমটি আবিষ্কার করেন, সে সময় বর্তমান সীতা মন্দিরটি ছিল ঘনজঙ্গলে ঢাকা। এই আশ্রম আবিষ্কারের কাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর বহু বিশেষজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এখানে এসে সব কিছু দেখে ও বিশ্লেষণ করে এটিই প্রাচীন মেধস মুনির আশ্রম বলে স্বীকৃতি দেন। এরপর থেকেই শুরু হয় এই স্থানটির উত্থান। মন্দিরের জন্য দানে পাওয়া যায় ৬৮ একরেরও বেশি দেবোত্তর সম্পত্তি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এখানে চণ্ডীমাতার মন্দিরটি তৈরি করে দেন। পরে তৈরি হয় বাংলাদেশের একমাত্র কামাখ্যা মন্দিরটিও। সব মিলিয়ে করলডেহার এই মেধস আশ্রম হয়ে ওঠে বাংলাদেশের এক পুণ্যতীর্থ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় এই আশ্রম ও মন্দির বিধ্বস্ত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে গড়ে ওঠে এই আশ্রম ও মন্দির। কিন্তু বর্তমানে অভিযোগ উঠেছে, বিধর্মীরা আশ্রমের ৫৫ একর জমি অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছেন। এই খবরে বাংলাদেশের হিন্দুরা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। চলছে হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা। আর সে সবের মধ্যেই মেধস মুনির এই আশ্রম হিন্দুর পবিত্র তীর্থ হিসেবেই রয়েছে বিরাজিত। ◘

ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বুড়িমার পূজা

গীতশ্রী চক্রবর্তী

গ্রামটির নাম ধোড়াদহ। নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার অধীন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নদীয়ার প্রাচীন পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হলো ধোড়াদহ চৌধুরী বাড়ির 'বুড়িমার পূজা'।

এই পূজার সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসের কথা। সময়টা মুঘল আমল। দিল্লির মসনদে তখন বাদশা আকবর। বঙ্গের অন্যসব রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেও ব্যতিক্রমী ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের যশোরের বারোভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্য। অপমানিত দিল্লির বাদশা তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে হুকুম দিয়ে বসলেন যেকোনো উপায়ে প্রতাপাদিত্যকে তাঁর কাছে হাজির করতে হবে। গুপ্তচর মারফত সংবাদটি কর্ণগোচর হতেই তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। কেননা যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর নাবালক দুই শিশু পুত্র উদয়াদিত্য ও সংগ্রামাদিত্যের দায়িত্ব কে নেবে? এহেন সংকটকালে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান দুর্গারাম মৈত্রগাঁই (পরবর্তীতে যিনি চৌধুরী উপাধি লাভ করেন) তাঁর চিন্তার অবসান ঘটিয়ে নাবালক দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে আসেন ধোড়াদহ গ্রামে।

তখন ধোড়াদহ ছিল জঙ্গলে ভরা জনবসতিহীন এলাকা। সেইখানেই দুর্গারাম প্রতাপাদিত্যের দুইপুত্রকে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন বেশ কিছুদিন। তখনই তিনি মানত করেন যুদ্ধ শেষে তাঁদের অক্ষত অবস্থায় রাজার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারলে তিনি এই গ্রামেই মাকে প্রতিষ্ঠা করবেন। যুদ্ধ মিটে গেলে তাঁদের রাজার হাতে তুলে দিলে, প্রতাপাদিত্য খুশি হয়ে দুর্গারামকে পাঁচটি মহল দান করেন যার মধ্যে অন্যতম ধোড়াদহ। ফলস্বরূপ, দেওয়ান দুর্গারাম হয়ে ওঠেন জমিদার দুর্গারাম চৌধুরী। মানত অনুযায়ী দুর্গারাম ধোড়াদহের জঙ্গলে খানিকটা জায়গা সাফ করে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে খড়ের আটচালায় মাকে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে আজও তিনি 'বুড়িমা' নামে পূজিত হয়ে আসছেন। পরবর্তীকালে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্গারাম সুদৃশ্য খিলান যুক্ত নাটমন্দির ও পৃথক গর্ভগৃহ বিশিষ্ট ঠাকুরদালান তৈরি করেন।

একচালা বিশিষ্ট সাবেকি বুড়িমা'র মূর্তি যাঁর দুটি সম্মুখ বাহু প্রমাণ মাপের, অপরদিকে কাঁধের দুইপাশে চারটি চারটি করে ছোটো ছোটো আটটি বাহু বর্তমান। প্রতিমা শিল্পী গ্রামেরই মালাকার পরিবার, যাঁরা বংশপরম্পরায় এখনো মায়ের প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। কালিকাপুরাণ মতে মায়ের পূজা করা হয়। মায়ের বেদিতে পূজার চারদিন রাখা হয় শালগ্রাম শিলা, বাণেশ্বর শিব ও মা মঙ্গলচণ্ডী। আগে মায়ের বোধন হতো মহালয়ার দিন কিন্তু বর্তমানে ষষ্ঠীর দিন মায়ের বোধন ও অধিবাস সমাপন হয়। পঞ্জিকা অনুসারে নির্ধারিত সময়েই ওইদিন মাকে বেদিতে স্থাপন করা হয়। মহাসপ্তমীর সকালে কলাবউ স্নান, ঘট স্থাপন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মহাস্নানের মধ্য দিয়ে পূজার শুভারম্ভ হয়। মহাসপ্তমী থেকে জলপানি (ফল, লুচি ও মিষ্টান্ন) ভোগ ও অন্ন ভোগ-সহ রকমারি ব্যঞ্জন, পরমান্ন মাকে নিবেদন করা হয়ে থাকে। মহাষ্টমীতে খিচুড়ি, আট রকম ভাজা ও পরমান্ন ভোগ।

মহাসন্ধিতে মায়ের ভোগ হিসেবে নিবেদিত হয় লুচি, পায়েস, ফল ও মণ্ডা-মিঠাই। কথিত, আগে কামান দেগে শুরু হতো সন্ধিপূজা। মহানবমীতে সকালে পুকুর থেকে মাছ তুলে মাকে মাছ ভোগ নিবেদন করা হয়, সঙ্গে খিচুড়ি, পোলাও, নয় রকম ভাজা, চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। দশমীতে মায়ের ভোগ একটু ভিন্ন স্বাদের, মাকে নিবেদন করা হয় পান্তাভাত, লেবু-লঙ্কা ও কচুর শাক। এরপর মায়ের ঘটে বিসর্জন, সিঁদুরখেলা ও অপরাজিতা পূজার মাধ্যমে দশমী পূজা সমাপন হয়। পূজার চারটি দিন দূরদূরান্ত থেকে মাকে দর্শনের জন্য অজস্র ভক্তের ঢল নামে। দশমীতে কাঁধে করে মা নিরঞ্জনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। গ্রামের খড়েনদীতে মা বিসর্জিত হন। গ্রামে প্রায় ১৩টি পূজা হয় এবং সর্বপ্রথম বুড়িমার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে নিরঞ্জন পর্ব শুরু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুড়িমার পূজা শুরুর আনুমানিক পঞ্চাশ বছর পর দুর্গারামের দুই পুত্র রামেশ্বর চৌধুরী ও বীরেশ্বর চৌধুরীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। রামেশ্বর চৌধুরী পৃথকভাবে রাতারাতি প্রতিমা গড়িয়ে বুড়িমার মন্দিরের অনতিদূরে আরেকটি দুর্গাপূজার আয়োজন করেন যা 'ছোটমা'-র পূজা নামে খ্যাত। বুড়িমার মতোই এই পূজারও নিয়মরীতি একই। সেই থেকে বুড়িমার পাশাপাশি ছোটমার পূজাও ধারাবাহিক ভাবে হয়ে আসছে।

বর্তমান মন্দির সময়ের স্রোতে তার জৌলুস অনেকাংশেই হারিয়েছে। আগে অনেকগুলি খিলান থাকলেও বর্তমানে তা মাত্র ছটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির প্রবীণদের মুখে শোনা যায় আগে নাকি জমিদারগিন্নিরা চিকের আড়ালে বসে পূজা দেখতেন, বর্তমানে এসব রীতি কল্পনাতীত। এখন বুড়িমার পূজায় শহরের আর পাঁচটি পূজার মতো আলোর রোশনাই হয়তো নেই ঠিকই কিন্তু নিয়ম, নিষ্ঠা ও ভক্তি অটুট রেখে আজ ৪১১ বর্ষে পদার্পণ করেও সেই সুপ্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে। □

চিত্তরঞ্জন পার্কের দুর্গাপূজা বাঙ্গালিয়ানায় ভরপুর

অত্রি মল্লিক

‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর;
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা...’

বঙ্গপ্রদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রমে করে বাঙ্গালির সার্বজনীন দুর্গাপূজা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত তথা সমগ্র বিশ্বের নানা প্রদেশে বিস্তারিত হয়েছে, উদ্‌যাপনের আনন্দ যজ্ঞের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীব্যাপী। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেমন বছরভর প্রায় সবরকম আর্থিক ও সামাজিক আবর্তন পরিলক্ষিত হয় এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে, ঠিক তেমনি নতুন দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কেও সারা বছর মনুষ্য মনের মণিকোঠায় চক্রাকারে একটা পরিকল্পনা আবর্তিত হয়, এই দুর্গাপূজা উৎসব ও তার উদ্‌যাপনকে ভিত্তি করেই। খুঁটি পূজা, পূজা প্যান্ডেল, জনসমাগম, বার্তালাপ, খাদ্যান্বেষণ, নতুন পোশাক, শুভেচ্ছা বিনিময়, আলোর রোশনাই— আক্ষরিক অর্থেই এ যেন সামাজিক আনন্দপূর্তি।

সম্ভবত ১৯৭০ সালে চিত্তরঞ্জন পার্কের ১ নম্বর মার্কেটের উলটো দিকের খোলা জায়গায় প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্গাপূজা চলাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও সেই হেতু এক-দুমাস ধরে অনুশীলন চলে চিত্তরঞ্জন পার্কের পরিবারগুলিতে। দুর্গাপূজাতে মিহির ঘটক চৌধুরী ও প্রভাত ঘোষ অভিনীত যাত্রা ‘রাজা দেবীদাস’ জনমানসে সাড়া ফেলেছিল। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপ সজ্জার কাজ করার জন্য চিত্তরঞ্জন পার্কের রাস্তায় বাসিন্দাদের আনাগোনায় উৎসব অন্য মাত্রা পায়। ক্রমান্বয়ে সমগ্র দিল্লি জুড়ে বাঙ্গালির সংখ্যাধিক্যের কারণেই বর্তমানে শুধু দিল্লিতেই কম-বেশি দুশো পঞ্চাশের বেশি সংখ্যক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেবল বারোয়ারি পূজা অথবা মন্দির প্রাঙ্গণের দীর্ঘ সময়ের পূজাই নয়, পারিবারিক স্তরেও নতুন দিল্লিতে বেশ অনেকগুলি দুর্গাপূজা হয় যার মধ্যে চিত্তরঞ্জন পার্কও ব্যতিক্রম নয়। কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া, মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর এবং আরও সামাজিক অবস্থার কারণে অনেক বাঙ্গালি দলে দলে আশ্রয় নিয়েছিলেন নতুন ও পুরনো দিল্লিতে। কর্মসূত্রে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছে এমন বাঙ্গালির সংখ্যাও এখন বেশ বেড়েছে। ফলে দুর্গাপূজার সংখ্যাও বেড়েছে অনেক বেশি।

দিল্লির বাঙ্গালি পরিমণ্ডলে ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম হলো চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটি বা সংক্ষেপে কেএমএস অথবা শিবমন্দির। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দিরের দুর্গাপূজা এই নিরিখে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির চিত্তরঞ্জন পার্কের অধিবাসীদের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটা চোখে পড়ার মতো বিষয় হলো ধর্মভাব ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি গভীর অনুরাগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকেই ক্রমশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত দিল্লিতে বসবাসকারী বাঙ্গালির সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছিল। দেশভাগের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির ফলস্বরূপ এই ধীরগতির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হঠাৎ বেশ অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো।

চিত্তরঞ্জন পার্কের দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অন্তত এক মাস আগে থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে মণ্ডপ সজ্জা তৈরি হয়ে যায়, হইহই করে শুরু হয় নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের। অবাক হতে হয়, বাঙ্গালি ও ওই অঞ্চলের বসবাসকারী অবাঙ্গালি মানুষও অফুরান উৎসাহে অংশ নেন এই অপূর্ব উদ্‌যাপনে। রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলগীতি, বাংলা আধুনিক গান, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রগীতি, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নৃত্য প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ এবং আরও রকমারি প্রতিযোগিতা

ফঃ ৫

ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধ্যেতে এই মাসাবধি সময়কালে।

অস্থায়ী স্টলগুলোতে তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী কেনা-বেচার তথা হরেকরকম বাঙ্গালি খাবারের নিত্য সান্ধ্যকালীন আনাগোনা। আর এসব কিছুকে কেন্দ্র করে একটা অবিস্মরণীয় উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জন পার্কের আনাচে কানাচে। সমকালীন সময়ের নিত্যনতুন সব ডিজিটাল ব্যাকড্রপ ও চিত্রকলায় সেজে ওঠে এই পূজা প্রাঙ্গণের সবটুকু। সঙ্গে থাকে কিছু নতুনত্বের ছোঁয়া। প্রত্যেক বছরেই প্রতিমা আনয়ন থেকে মূর্তি বিসর্জন পর্যন্ত সবেতেই থাকে ভরপুর বাঙ্গালিয়ানার স্পষ্ট ছাপ। পূজার চারটে দিন আজকাল লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে একদা কিঞ্চিৎ অপরিচিত তথা নতুন দিল্লিস্থিত এই বাঙ্গালি পাড়ায়। চিত্তরঞ্জন পার্কের পূজা প্যান্ডেলগুলির মতো কালীমন্দিরেও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভোগ ও অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। নরনারায়ণ সেবায় নিযুক্ত হন সমাজের সুধীজন। পূজার জোগাড়, আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা দেখভাল, ভোগ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— সব কিছুতেই পুরুষদের মতো এই অঞ্চলস্থিত মাতৃশক্তিও সামনে থেকে নেতৃত্ব দান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এক অন্যরকম সার্বিক আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে। আকাশে-বাতাসে তখন শরতের আলো ও গন্ধ, আর তৎসংলগ্ন মানুষের মানসচক্ষে উৎসবের অনাবিল আবেশ— এ যেন প্রকৃতি ও তার সন্তানদের অটুট বন্ধনের বাস্তবিক চিত্রায়ণ।

চিত্তরঞ্জন পার্কের অন্যান্য পূজাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বি ব্লক ও কোঅপারেটিভের বা কে ব্লকের পূজা। এ বছর এই দুটি পূজা মণ্ডপই সারা রাত উন্মুক্ত থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য। এই দুটি পূজাই প্রায় ৫০ বছর পূর্তির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দিরের মতো এখানেও প্রাকপূজা প্রতিযোগিতা সমূহ তথা আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয় মূল পূজার নির্ঘণ্ট আগমনের পূর্বলগ্নেই। মা সারদা পার্কের বেদীতে বি ব্লকের এই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাহারি সব স্টলে রকমারি আয়োজনে জমজমাট হয়ে থাকে আনন্দ-প্রাঙ্গণ। দৈনিক ভোগ বিতরণ, বিশেষ প্রসাদের ব্যবস্থা, পুষ্পাঞ্জলি, দধিকর্মা বিতরণ— এ সব কিছুই খুব যত্ন করে ব্যবস্থা করা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। এছাড়াও চিত্তরঞ্জন পার্কের মেলা গ্রাউন্ডে, ডি-ব্লকে, ই-ব্লকে, মিলন সমিতিতে আরও কিছু বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রত্যেক বছর।

চিত্তরঞ্জন পার্ক সংলগ্ন আরও একটি পূজার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি হলো এই অঞ্চলের একেবারে নিকটস্থ 'অলকানন্দা' নামক এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি পাড়ায় দুর্গাপূজার আয়োজন। এই বছর অলকানন্দা পূজা সমিতির দুর্গাপূজার ৫০ বছর পূর্তি হতে চলেছে। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের তাগিদেই সর্বমোট প্রায় ১৫০টিরও বেশি পরিবার ঘরোয়া পরিমণ্ডলে এই দুর্গাপূজা করে আসছে বিগত চার দশক যাবৎ। পাঁচ থেকে পঁচাশি বছর বয়সের মানুষ এই পূজায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দৈনিক ছয়-সাত পদ বিশিষ্ট ভোগ বিতরণ করা হয় আনুমানিক ৬০০-৭০০ মানুষের মধ্যে। আর প্রতিদিন অন্তত ১০০০০-১৫০০০ দর্শনার্থীদের ঢল নামে এই পূজা মণ্ডপে। চিত্তরঞ্জন পার্কে বেশ কিছু পরিবার তাঁদের বাড়িতেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকেন।সব মিলিয়ে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব চিত্তরঞ্জন পার্কেও ধরা দেয় এক অন্য রূপে, অন্য পটে সার্বিক আনন্দঘন পরিবেশ ও উৎসবময়তার এক সুন্দরতম মিশেলে। পূজার কদিন দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক যেন কলকাতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। □

দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা

সর্বাণী চক্রবর্তী

বেদে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে এবং বৃহস্পতির ভগ্নী যোগসিদ্ধার গর্ভে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। কোনো কোনো পুরাণে বিশ্বকর্মাকে স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র বলা হয়েছে। বিশ্বকর্মা শিল্প সমূহের প্রকাশক, অলঙ্কারের স্রষ্টা এবং দেবতাদের জন্য বিমানের নির্মাতা। তাঁর কৃপায় মানবসমাজ শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করে। বিশ্বকর্মা অন্যতম উপবেদ 'স্থাপত্য বেদ'-এর প্রকাশক এবং চতুঃষষ্ঠী কলার অধিষ্ঠাতা।

ঋগ্বেদে তাঁকে সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য ও কল্যাণকর্মা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে বিশ্বকর্মার উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। যেখানে ব্রহ্মার নাভিকোষ থেকে বিশ্বকর্মার উৎপত্তি এবং শাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন পৌরাণিক উৎস অনুসারে ভগবান বিশ্বকর্মার স্ত্রীর নাম ঘৃতাচী। বামন পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাঁকে এই স্বর্গীয় অপ্সরার স্বামী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে বিশ্বকর্মার পাঁচ পুত্রের কথা জানা যায়। তাঁরা হলেন মনু, মায়া, ত্বাস্তর, শিল্পী ও বিশ্বজ্ঞ। এই পাঁচ পুত্র বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের পাঁচটি উপগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ, যথা কামার, ছুতার, ধাতু ঢালাইকারী, পাথর মিস্ত্রি ও স্বর্ণকার। রামায়ণ অনুসারে বানরীর গর্ভজাত বিশ্বকর্মার প্রকৌশলী পুত্র নল ও নীল। যারা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের প্রধান স্থপতি। মহাভারত অনুসারে দানবীর গর্ভে বিশ্বকর্মার পুত্র ময়দানব, যার হাতে নির্মাণ হয়েছিল পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ।

ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, বিশ্বকর্মা সর্বদর্শী ভগবান। তাঁর চক্ষু, মুখমণ্ডল বাহু ও পদদ্বয় সর্বত্র ব্যাপৃত। বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্য নির্মাণ করেছেন। বিশ্বকর্মা সৃষ্টিশক্তির রূপক নাম। তিনি ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা ও প্রজাপতি। বিশ্বকর্মা পিতা, সর্বজ্ঞ, দেবতাদের নামদাতা এবং মর্ত্যজীবের অনাধিগম্য। তিনি সর্বমেধ যজ্ঞে নিজেকে নিজের কাছে বলি দেন। ইনি বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য, কল্যাণকর্মা বিধাতা।

পুরাণমতে বিশ্বকর্মা বৈদিক ত্বষ্টাদেবতার কর্মশক্তিও আত্মসাৎ করেছিলেন। এই জন্য তিনি ত্বষ্টা নামেও অভিহিত। বিশ্বকর্মা কেবল দেবশিল্পী নন, দেবতাদের অস্ত্র সমূহেরও প্রস্তুতকর্তা। ইনি সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রের নির্মাতা। মহাভারত অনুসারে তিনি শিল্পের শ্রেষ্ঠ কর্তা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক, সর্বপ্রকার কারুকার্য-নির্মাতা। দেবলোক স্বর্গেরও স্রষ্টা বিশ্বকর্মা। রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরীও বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। বিশ্বকর্মা পূজার ধ্যানমন্ত্রেও আছে—

'ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্রকর্ম্মাকারক।

বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ ত্বং চ বাসনা মানদণ্ডধৃক্।।'

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা কন্যা সবর্ণার (মতান্তরে সংজ্ঞা) স্বামী সূর্য। সবর্ণা সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পারায়, বিশ্বকর্মা সূর্যকে শানচক্রে স্থাপন করে তাঁর তেজের অষ্টমাংশ কর্তন করেন। এই কর্তিত অংশ পৃথিবীর উপর পতিত হলে সেই তেজপুঞ্জের দ্বারা বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের পিনাক, কুবেরের পাশ, কার্তিকেয়র শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করেন। কথিত, শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের প্রথম দারুমূর্তি ছদ্মবেশে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। সূর্য ও সবর্ণার দুই পুত্র শনৈশ্চর ও যম এবং এক কন্যা কালিন্দী।

ওই পুরাণ অনুসারে, পুষ্করতীর্থে গমনকালে বিশ্বকর্মা কামবর্ধক মনোহর বেশধারী অপ্সরা ঘৃতাচীকে দর্শন করেন। বিশ্বকর্মা তখন সূর্যলোক থেকে ফিরছেন। স্বভাবতই মন তার প্রফুল্ল। ওই অপ্সরাকে দেখে তিনি কামমোহিত হলেন। ঘৃতাচী স্থির যৌবনা। তার কটাক্ষে সদা চঞ্চলতা। তার মনোমোহিনী রূপ ও কটাক্ষপাতে মুনি ঋষিরা পর্যন্ত কামান্ধ হয়ে পড়েন। কামশাস্ত্রবিদ বিশ্বকর্মা ওই অপ্সরার কাছে গিয়ে বললেন—

—হে সুন্দরী তুমি আমার প্রাণ হরণ করেছ। আমি তোমার অন্বেষণে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করেছি। তুমি আমার প্রাণ। তোমা বিনা আমি মৃত। ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব। কিন্তু রম্ভার কাছে সংবাদ পেলাম তুমি কাম ভবনে যাত্রা করেছ, তাই কালবিলম্ব না করে ছুটে এলাম।

একবার চেয়ে দেখ কী মনোরম নির্জন উদ্যান। সরস্বতী থেকে প্রবাহিত হচ্ছে স্নিগ্ধ শীতল বায়ু। এসো আমরা এই পুষ্পোদ্যানে শৃঙ্গারে রত হই। তুমি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। আর আমি মৃত্যুঞ্জয়ের বর লাভ করেছি। বরুণ আমাকে দিয়েছেন রত্নমালা। কুবেরের প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছি, প্রীত হয়ে কুবের দিয়েছেন

অফুরন্ত ধনরাজি। পবনদেব দিয়েছেন স্ত্রীরত্নভূষণ। বহ্নিশুদ্ধবস্ত্র সমূহ অগ্নিদেবের কাছ থেকে লাভ করেছি। কামদেবের কাছ থেকে কামিনী মনোরঞ্জক কামশাস্ত্র আর চন্দ্রের কাছ থেকে রতিবিদ্যা শিক্ষা পেয়েছি। আমার আহরিত সব সম্পদ সুখ সম্ভোগ শেষ হলেই তোমার হাতে তুলে দেব।

বিশ্বকর্মার সুন্দর বাক্যগুলি শ্রবণ করে ঘৃতাচী মৃদু হাসলেন। বললেন—

—হে কামপুরুষ! আপনার সব কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি মানবেন কিনা জানি না। যেদিন যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা গমন করি, সেই দিনের জন্য আমরা তাঁর পত্নী। আজ আপনি কামদেবের জন্য প্রস্তুত, তাই আজ আমি কামদেবের জন্য প্রস্তুত, তাই আজ আমি আপনার গুরুপত্নী। কারণ আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, কামদেবের কাছে কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরু পিতার থেকে লক্ষগুণ এবং মাতার থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে বীর্যবান পুরুষ! শাস্ত্র বলে যে নারী মাতৃসমা। তার সঙ্গে দেহ সম্ভোগ করলে কালসত্র নরকে গতি হয়। গুরুপত্নীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলে কুম্ভীপাক নামক ভয়ংকর নরকে গমন হয়। ব্রহ্মার বয়সকাল পর্যন্ত সেখানে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

ঘৃতাচী আরও বললেন—

---পরপুরুষের সঙ্গে গুরুপত্নী যদি স্বেচ্ছায় রমণ করে তাহলে তারাও একই দোষে দুষ্ট হবে। তাই বলছি আজ আমি কামিনী, কামদেবের ভবনে যাচ্ছি। কামদেবের সঙ্গে রমণ করব বলে। অন্যদিন আপনার ঘরণী সেজে আসব। আজ চলি।

ঘৃতাচীর এহেন আচরণে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে ভূতলে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিলেন। ঘৃতাচীও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমার অভিশাপে তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেবে।

বিশ্বকর্মার অভিশাপে ঘৃতাচী মর্ত্যের প্রয়াগধামে জন্ম নিলেন মদন নামে এক গোপের ঘরে। তিনি হলেন জাতিস্মর। ধর্মপরায়ণা এই কন্যা মনোরম গঙ্গাতীরে তপস্যায় রত হলেন। ক্রমে শতবর্ষ অতীত হলো। কিন্তু তপস্বিনীর শরীরের কান্তি তখনও তপ্ত কাঞ্চনের মতো।

এদিকে ঘৃতাচীর অভিশাপ পেয়ে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মার পাদবন্দনা করে তাঁর কাছে আদ্যন্ত নিবেদন করলেন। ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন।। তিনি ব্রাহ্মণ পুত্র হয়েও শিল্পকর্মে বিশেষ পারদর্শিত হলেন। রাজা ও সম্ভ্রান্তভবনে শিল্পকর্মের জন্য তাঁর ডাক পড়ে। তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। সর্বদা তিনি শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন থাকেন।

প্রয়াগ নৃপতির এক শিল্পকর্ম সমাপ্ত করে তিনি একদিন গিয়েছিলেন গঙ্গায় স্নান করতে। তপস্বিনী গোপকন্যাকে দেখে শিল্পীর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। এই তপস্বিনী আর কেউ নয়, ঘৃতাচী। তিনি কামানলে দগ্ধ হয়ে ছুটে গেলেন সেই ব্রহ্মচারিণীর কাছে। বললেন—

---হে বরাননে! তুমি ঘৃতাচী, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমাকে এখানে দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। হে সুন্দরী। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ, আমি বিশ্বকর্মা। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে চাই। আমি কামপীড়িত। তুমি এসো, আমার কামনা চরিতার্থ করো এবং শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করো।

তপস্বিনীরূপী ঘৃতাচী বললেন—

—হে বিশ্বকর্মা! এই ত্রিবেণীসঙ্গম প্রয়াগ এক পুণ্যক্ষেত্র। পূর্বজন্মের কথা আমার সব মনে পড়েছে। এই মনোরম গঙ্গাতীরে শৃঙ্গার দান কি সম্ভব? ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তপস্যা বলে মোক্ষলাভ করার উদ্দেশ্যে মর্ত্যে আসেন, বিষ্ণুর মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ থেকে নির্দিষ্ট কর্ম করেন। ঈশানমায়া দুর্গাদেবী যার প্রতি সদয় হন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভক্তি ও ঈপ্সিত মন্ত্র দান করেন। আর সে বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে ভুলে যায়, বিষয়াসক্ত হয়, সে মহামূর্খ।

হে বিশ্বকর্মা! এখানে পতিতপাবনী গঙ্গা আছেন। অন্য জায়গায় পাপ করলে তা এই গঙ্গায় নাশ হয়। কিন্তু এই গঙ্গাতীরে পাপকার্যে লিপ্ত হলে পাপ শতগুণ বেড়ে যায়। অতএব হে সুশীল! আপনি নিজেকে সংযত করুন।

বিশ্বকর্মা তখন ঘৃতাচীকে অদৃশ্যভাবে মলয় পর্বতের চন্দন উদ্যানে নিয়ে গেলেন। সেখানে এক নির্জন স্থানে তাঁরা পুষ্পশয্যায় সম্ভোগে প্রবৃত্ত হলেন। বিশ্বকর্মার শক্তি ঘৃতাচী নিজের গর্ভে ধারণ করলেন। সেখানেই তাঁরা কুটীর নির্মাণ করে গার্হস্থ্য আশ্রম পালন করেন। ক্রমে ঘৃতাচী নয়টি পুত্রের জন্ম দেন। উভয়ে পুত্রদের যত্নসহকারে প্রতিপালন করেন। পুত্ররা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচী মানবদেহ পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যান।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের আদেশ লঙ্ঘন করার ফলে বিশ্বকর্মার বংশের অনেকে ব্রহ্মার শাপে পতিত হয়েছিল। এই পতিত সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে মানবজাতির নিত্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বিভিন্ন শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এরা বিশ্বকর্মার বংশধর রূপে স্বীকৃত।

চিত্রকরের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে অট্টালিকাকারের জন্ম হয়। অট্টালিকাকারের ঔরসে এবং কুম্ভকার কন্যার গর্ভে কোটক জাতির সৃষ্টি। কুম্ভকার ও কোটক রমণীর মিলনে সৃষ্টি হয় তৈলকার জাতির। তীবর জাতি এল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রমণীর মিলনের ফলে। তীবর স্ত্রীর গর্ভজাত লেট জাতি। চণ্ডাল জাতির জন্ম দেয় শূদ্র ঔরসে ও ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভ। চণ্ডাল ঔরসে ও চর্মকার গর্ভে মাংসছেদি ব্যাধজাতির জন্ম হয়।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজা কোনো তিথি নক্ষত্র মেনে হয় না। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্ভুজ বিশ্বকর্মার বাহন হাতি। বিশ্বকর্মার উপরের ডান হাতে দাঁড়িপাল্লা থাকে। দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লা জ্ঞান ও কর্মের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এক হাতে হাতুড়ি, অন্য হাতে মশাল থাকে। হাতুড়ি শিল্পের প্রতীক এবং মশাল জ্ঞানের প্রতীক। বঙ্গে বিশ্বকর্মার হাতে ঘুড়ি দেওয়ার প্রচলন আছে। বঙ্গে বিশ্বকর্মা পূজায় ঘুড়ি উড়ানোর প্রথা দেখা যায়। এই সময়ে বর্ষা বিদায় নেয়। আকাশ নির্মল থাকে, ঘুড়ি ওড়ানোর প্রকৃষ্ট সময়। সাধারণত কল-কারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজা হয়ে থাকে। তবে ইদানীং পূজার আচার, নিষ্ঠা থেকে উদ্যোক্তাদের আড়ম্বরের দিকে বেশি ঝোঁক দেখা যায়।

মা আসছেন

বৈশাখী কুণ্ডু

একই অঙ্গে মাতা, জায়া, কন্যা, জননী, ভগ্নী। প্রতিটি সম্পর্কের বাঁধন যত দৃঢ় হয় সম্পর্ক তত মধুর হয়। সামাজিক সম্পর্কের নিবিড় স্নেহ ভালোবাসার বন্ধনে মানুষ চিরকালই আবদ্ধ। সেই বন্ধনে স্বর্গের দেব-দেবীরাও আবদ্ধ। দেবী মহামায়াকে কন্যা এবং পরম শিবকে জামাতা রূপে কল্পনা বাঙ্গালিজাতির এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। তাইতো প্রতি বছর আশ্বিনের মাঝামাঝি মা মেনকার ঘরে মা মহামায়ার কন্যা রূপে আগমন ঘটে। সোহাগে-বিরাগে, হাসি-কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা আগমনী গানে মেতে ওঠে।

শরৎকালে দেবী দুর্গার পিত্রালয়ে আগমনকে কেন্দ্র করে জনমানসে আনন্দ ও ভক্তিরসের উন্মাদনা জাগে। তখন তো তিনি দেবী নন, তিনি আপামর বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে উমা। সে মেয়ে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসছে। উল্লেখ্য, সঙ্গে শুধু চার সন্তানই নয়, সন্তানদের বাহনরাও থাকে। এছাড়া অশুভ শক্তির প্রতীক মহিষাসুরকেও পরিবারের সদস্য রূপে স্থান দিয়েছেন। এই পরিবারের মধ্য দিয়ে মা মহামায়া আমাদের এই বার্তাই দেন যে, শুধু মানুষ নয়, প্রাণী ও বৃক্ষদেরও সমান যত্ন নিতে হয়।

পৌরাণিক ব্যাখ্যায় দেখা যায় দেবীর আগমন বা গমন কখনো হাতি, কখনো পালকি, নৌকা বা ঘোড়ায় চড়ে। এই প্রতিটি বাহনে চড়ে আগমন বা গমনের ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যেমন— রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, দুর্যোগ, খরা, ভূমিকম্প, শস্যশ্যামলা ভূমি ইত্যাদি পৃথিবীর বুকে হবে এমন ভাবনা বিরাজ করে। এমনকী সারা বছর কেমন যাবে তাও নির্ভর করে। এগুলির সবই পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে কি? ওই প্রতিটি বাহনে চড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে গেলে শরীরে ভিন্ন অনুভূতি জাগে তার প্রভাবে ধারণাগুলির উন্মেষ ঘটতে পারে।

দেবী দুর্গার কন্যা রূপে পৃথিবীতে আগমন উপলক্ষ্যে প্রকৃতি যেন নবরূপে সজ্জিত হয়। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, হাওয়ায় দোলা কাশবন, শিউলি ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ, ঘাসের ডগায় শিশিরের বিন্দুতে ভোরের আলো, যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য তৈরি হয়। গ্রীষ্মকালের দাবদাহনের পর বর্ষা স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসে। রুক্ষ শুষ্ক মাটির উপর বৃষ্টির জল পড়ে। তারপর শরৎ ঋতুতে সেই মাটিতে আমন ধানের দোলা লাগে। রবি ঠাকুর এই শরৎ ঋতুকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা করেছেন—

'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি

...শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি'— প্রকৃতির প্রতিটি বর্ণনা কবির কলমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আবারও 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হওয়ার পরে'— শরৎ কালের আমেজ কবিতাটির পরতে পরতে লেগে রয়েছে। কবিগুরু শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য নিজে উপভোগ করবেন এবং ছাত্রদের মধ্যে জাগরিত করাবেন। শারদোৎসব মূলত কবির লেখা একটি নাটক। যার বিষয়বস্তুতে রয়েছে প্রকৃতিকে উজাড় করে ভালোবাসা।

শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশফুলের বাহার, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ইত্যাদির সঙ্গে ঢাকির ধুমুল মনে করিয়ে দিচ্ছে মায়ের পিত্রালয়ে আগমনের বার্তা। আগমনী গানে শরতের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সৃষ্টিতে মা দুর্গার বিভিন্ন দিক বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। কোথাও দেখা গেছে রণরঙ্গিনী রূপ, কোথাও ঘরের মেয়ে, আবার কোথাও ভক্তের হৃদয় বিগলিত আনন্দ। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশের ফলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারাগার বন্দি হতে হয়। কবিতাটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি :

'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলা মূর্তি-আড়াল?/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।' অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তার পরবর্তীকালে শাক্ত পদালবী বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। মূলত উমা, পার্বতী, চণ্ডী ও কালিকাকে কেন্দ্র করে শাক্ত পদাবলীর বিকাশ। একাধারে মেনকার সঙ্গে উমার পিত্রালয়ে মিলন, অপরদিকে বাঙ্গালির জীবনের নানা দিক ফুটে ওঠে এই আগামনী গানগুলিতে। মা মেনকার মধ্য দিয়ে সাধারণ বাঙ্গালি ঘরের মায়েদের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পর্যন্ত মা ও মেয়ে একসঙ্গে থেকে নিজেদের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেবার পর নবমীর রাতেই বিষাদের সুর বেজে ওঠে। কারণ পরদিন সকালে তো উমার পিত্রালয় ছেড়ে কৈলাশে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হয়। গিরিরাজকে মেনকা বলে, 'আমার গৌরী রে লয়ে যায় হর আসিয়ে/কি কবা হে গিরিবর রঙ্গ দেখ বসিয়ে।'

এইভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেবী মহামায়ার কন্যা রূপে মা মেনকার গৃহে আগমনের উৎসবে মর্ত্যবাসী মিলনোৎসবে মেতে ওঠে।

লালির ছানা

লালির মনে ভারি দুঃখ। অন্য মুরগিদের অনেক ছানা হয়েছে। কেমন গোল গড়ন, সরু ঠোঁট, ছোট ছোট পায়ে তুরতুর করে ছোটে। লালির মোটে একটা ছানা, তাও ধ্যাবড়া গড়ন, চ্যাপটা ঠোঁট, থ্যাবড়া পায়ে ল্যাগব্যাগ করে হাঁটে। সবাই হাসে, বলে,--- 'ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ।'

সেদিন মুরগিরা সবাই বেড়াতে গেল. সব ছানারা ঘাসে খেলা করছে, আর লালির ছানাটা সোজা গিয়ে পুকুরে নামল। লালি কত চেঁচাল, সে ফিরেও চাইল না, কচি ডানা ঝটপটিয়ে, থ্যাবড়া পায়ে জল ছিটিয়ে মনের আনন্দে স্নান করতে লাগল।

হঠাৎ 'প্যাঁক-প্যাক-প্যাঁক!' — পাশের বাড়ি থেকে একপাল ছানা নিয়ে দুটো হাঁস এসে জলে নামল। লালির ছানাও অমনি 'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক' করে সাঁতার কেটে চলল সেই দিকে— এমনি তাদের দলে মিশে গেল যে লালি চিনতেই পারল না কোনটা তার ছানা।

সাদি, কালি, লালি, হলদি, সবাই অবাক হয়ে বলল— 'কঁক-কঁক-কঁক? এর মানে কী?'

এর মানে যে কী, তা শুধু ভজুয়া জানে। ভজুয়া দুই বাড়িতেই কাজ করে। সাদি, কালি বসে ডিমে তা দেয়, লালির ডিম নেই, তবু সে ওদের দেখাদেখি বসে থাকে, তাই ভজুয়া চুপিচুপি ও-বাড়ি থেকে একটা হাঁসের ডিম এনে লালির ঝুড়িতে রেখেছিল। ডিম ফুটে যখন ছানা বেরোল, লালি ভাবল ওটা তারই ছানা!

পুণ্যলতা চক্রবর্তী।
ছবি ঃ সত্যজিৎ রায়।

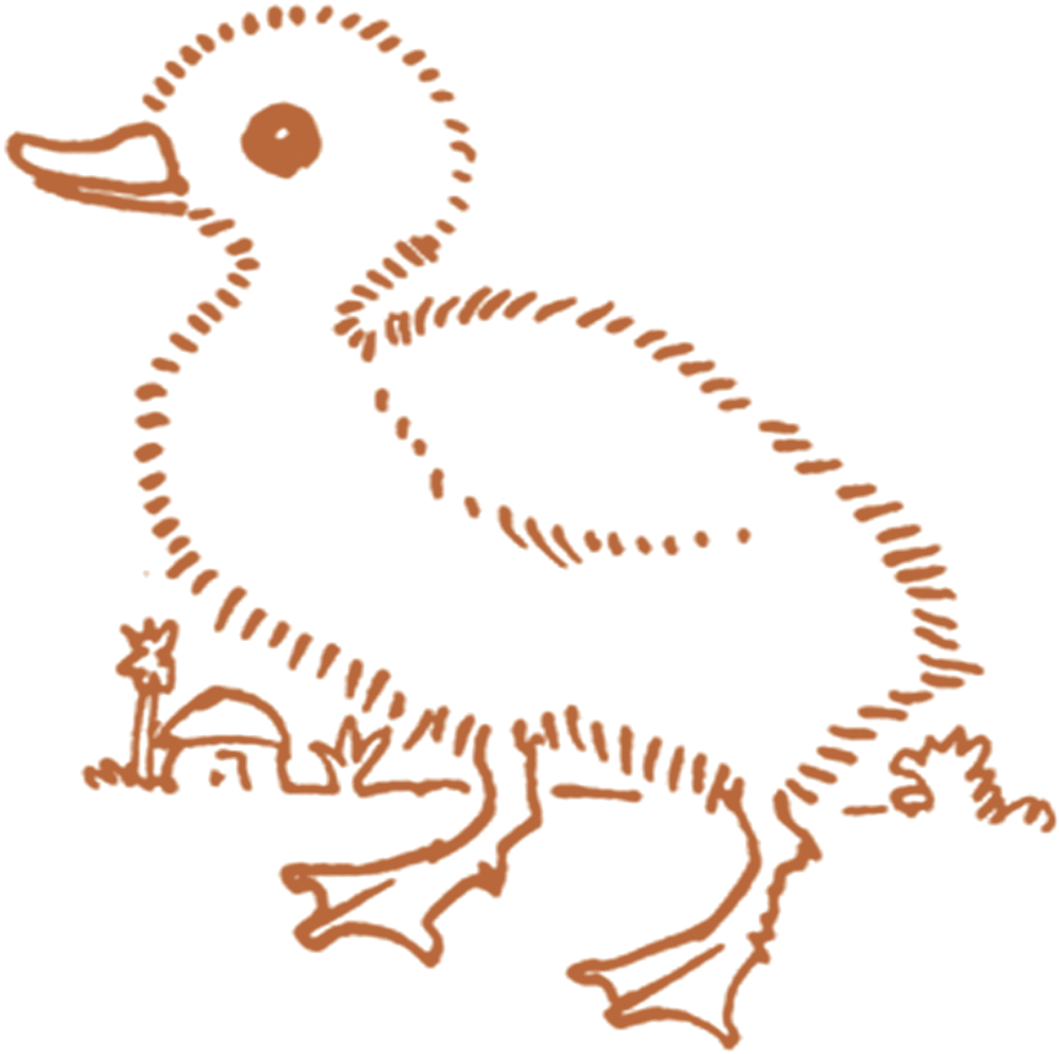

জাতীয় উদ্যান

সেলিম আলি

সেলিম আলি জাতীয় উদ্যান ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীনগরে অবস্থিত। বিখ্যাত পক্ষীবিদ সেলিম আলির নামে ১৯৮৬ সালে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ৯ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যানে ১৫০ প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে কস্তুরী হরিণ, হিমালয় চিতাবাঘ, হিমালয় কালো ভালুক, উড়ন্ত শেয়াল প্রধান। উদ্যানের শান্ত পরিবেশ, এর সবুজ বনানী, ঝলমলে জলাশয়, রাজকীয় পাহাড় পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র। এই উদ্যান দর্শনের সেরা সময় হলো মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস। এই উদ্যানের কাছাকাছি দর্শনীয় স্থান হলো শালিমার বাগ মুঘল গার্ডেন এবং ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৩

अभ्यासं कुर्मः --
यानं चलति। यानानि चलन्ति।
গাড়ি চলে। গাড়িগুলি চলে।
फलं पतति। फलानि पतन्ति।
सुखम् आगच्छति। सुखानि आगच्छन्ति।
दुःखं भवति। ....।
कार्यं नास्ति। ....।
धनं गच्छति। ....।
मित्रं खादति। ....।
....। ....।
प्रयोगं कुर्मः--(নিজে নিজে বাক্য রচনা করতে হবে)
द्रव्यम्, दैवम्, भाग्यम्, चरित्रम्।

ভালো কথা

ঘুড়ির সুতোয় কাক

সেদিন আমরা শাখায় মহালয়ায় কার্যক্রমের জন্য সামূহিক ব্যায়ামযোগ করছিলাম। তখন পাশেই শয়ে শয়ে কাক কা কা করে চিৎকার করছিল। আমরা কেউ মনযোগ ঠিক রাখতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা কাক গাছ থেকে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কুকুর ছুটে এল কাকটিকে খেতে। দেবুদা আমাদের গণ নিচ্ছিলেন। আমাদের আরম দিয়ে তিনি ছুটে গিয়ে কাকটিকে হাতে তুলে নিলেন। তখনই আমি আর সুকুও ছুটে গেলাম। দেখলাম, কাকটির পায়ে ও দুই ডানায় ঘুড়ির মাঞ্জা সুতো জড়িয়ে আছে। আমরা ধীরে ধারে সুতোর প্যাঁচ খুলে দিয়ে কাকটিকে ছেড়ে দিলাম। কাকটি লাফিয়ে লাফিয়ে রেলিঙের উপর গিয়ে বসল। তারপর ওখান থেকে আবার একটু লাফিয়ে গাছের ডালে বসল। নীচে তখনও কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছিল।

দীপমাল্য সাউ, পঞ্চমশ্রেণী, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল শী হি ত
(২) সা সু না ধ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) রি র য়া হা দু জা
(২) ক ং শা সি হ ব

১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) পশ্চিমবঙ্গ (২) প্রজাপালন

১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) পুরাণকাহিনি (২) হিসাবরক্ষক

(১) স্বপ্না সেন, ঝালদা, নামোপাড়া, পুরুলিয়া। (২) সুজয় মহাপাত্র, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া। (৩) অর্ঘ্য মাজী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া। (৪) স্নেহাংশু রায়, বালিগঞ্জ, কল- ১৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

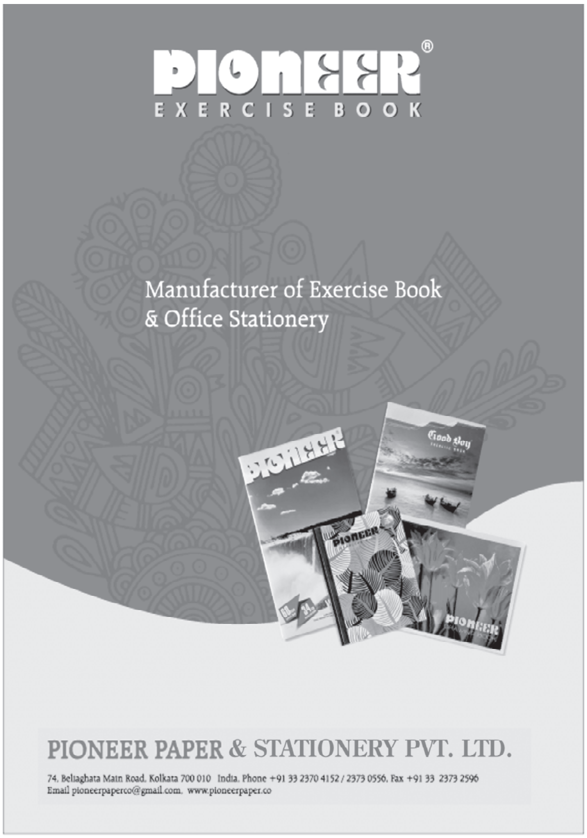

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

প্রত্যেক হিন্দুর করণীয় বিধি পিতৃপক্ষে পিতৃতর্পণ

গোপাল চক্রবর্তী

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পক্ষটি পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত। অবশ্য এই পক্ষকে অপরপক্ষ, প্রেতপক্ষও বলা হয়। এই দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পার্বণ শ্রাদ্ধের রীতি আছে। কেউ কেউ পিতৃপক্ষের প্রতিদিনই তর্পণ করেন। পিতৃপক্ষ মহালয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই মহালয় শব্দ থেকে মহালয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই পিতৃপক্ষে যমলোক থেকে পূর্বপুরুষদের আত্মা মর্ত্যে আগমন করেন জল পিণ্ডের আশায়। পিতৃপক্ষ পিতৃপুরুষদের উৎসবের আধার। গঙ্গা বা অন্যান্য স্রোতস্বিনী অথবা জলাশয়ে তর্পণ করা হয়। পুত্র-পৌত্রাদির হাতে জল, পিণ্ড লাভের পর পরিতৃপ্ত পূর্বপুরুষদের আত্মা আবার যমলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের এই যমলোকযাত্রা যাতে সুগম হয় তার জন্য উল্কা বা আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। এখনো অনেক বনেদি বাড়িতে পুরো কার্তিকমাস আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা আছে।

পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত জল দানের শাস্ত্রীয় বিধান আছে। তবে বর্তমানে পিতা থেকে বৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্যন্ত পঞ্চম পুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করা হয়। পিতৃপক্ষে তর্পণ যে শুধু পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে করা হয় তা নয়, তর্পণের সূচনা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ও প্রজাপতিকে জল দানের মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা যে কতটা উদার ছিলেন তা তর্পণের এই বিশেষ মন্ত্রটির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়।

'ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিক্ষপা খগাঃ।।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈ বা কাশ গামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।।
তেষামাপ্যায় নায়ৈ তদু দীয়তে সলিলং ময়াঃ।।

সনাতন ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, সর্প, বৃক্ষলতা, বিদ্যাধর, জলধারা, অভুক্ত জীব, এমনকী যে পাপে অথবা অধর্মে নিরত, বিধিমতে তাদের উদ্দেশ্যেও তর্পণ করা হয়, জল প্রদান করা হয়। তর্পণের সময় হিন্দুরা মরীচি, অত্রী, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ প্রমুখ ঋষিকেও জল প্রদান করেন। দেবতা ও ঋষিদের সঙ্গে যম, বৈবস্বত মনু, চিত্রগুপ্ত, বৃকোদর ভীম এঁদেরকেও বিধি মতে জল প্রদান করা হয়।

মহান উদার ঋষিরা তর্পণের মধ্য দিয়ে দেবর্ষি, পিতৃকুল, মনুষ্য, সপ্তদ্বীপ নিবাসী, এমনকী ত্রিভুবনের সমস্ত অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির কথা বলেছেন। 'ওঁ আব্রহ্ম স্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যন্তু।' তর্পণ ক্রিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সংযোজন উপরোক্ত মন্ত্রটি। এখানে বলা হয়েছে তপর্ণকারীর প্রদত্ত জলে ব্রহ্ম থেকে 'স্তম্ব' অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত জগতের প্রতিটি বস্তুর তৃপ্তি হোক।

সেই সুদূর অতীতে ভারতীয় শাস্ত্রকাররা ছিলেন উন্নত ও উদার মানসিকতা অধিকারী। তর্পণ বিধির বিভিন্ন মন্ত্রে তাঁদের উদার মানসিকতা এবং সাম্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

'ওঁ যে অবান্ধবা বান্ধবা বা সেন্যজন্মনিবারবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মাৎ তোয়কাঙ্ক্ষিণ।।

আবার তাদের উদ্দেশ্যেও তর্পণ করা হয়, অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে সকল জীব নিহত হয়েছে কিংবা তর্পণকারীর নিজ কুলে যিনি অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, মন্ত্রপুত তর্পণের জলে যেন সবার তৃপ্তি হয়।

পিতৃপক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থের অপুত্রক ভীষ্ম তর্পণের বিধান আছে।

ওঁ বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে।।

ঋগ্বেদে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান রয়েছে এই তর্পণ তারই অঙ্গ। তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত পিতৃযজ্ঞ। পিতৃপক্ষে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত হিন্দুরা একই মন্ত্রে একই পদ্ধতিতে তর্পণ করেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে হিন্দুরা রয়েছেন সর্বত্রই পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করেন। আমাদের শাস্ত্র পিতাকে দেবতাদের অগ্রে স্থান দিয়েছে। পিতৃস্তুতিতে বলা হয়েছে—

ওঁ পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।।

তর্পণান্তে পিতৃপ্রণামে পিতাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। যেমন—

ওঁ পিতৃন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
সধাভুজঃ কাম্য ফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেহনাভিসংহিতেষু।।
পিতৃন্ বন্দে সদা ভক্ত্যা সর্ব্বদেব ময়ানবরান্।
ভুক্তিদান্ মুক্তিদান্ সৌম্যান্ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদান্।।
পিতরং জন্মদাতারং ভুক্তিদং মুক্তিদং প্রভুম্।
বাৎসল্য-করুণাপূর্ণং প্রণমাম পুনঃ পুনঃ।।

শাস্ত্রকাররা মাতৃপ্রণামের যে অনবদ্য মন্ত্র লিপিবদ্ধ করে গেছেন পৃথিবীর কোনো দেশে তার নজির পাওয়া যাবে না।

সর্ব্বদুঃখনিহন্ত্রী ত্বং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী।
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাতৃদেবী নমোস্তুতে।।
সর্ব্বমঙ্গলদাতৃকে সর্ব্বশোকহরাত্মিকে।
করুণাস্নেহ সম্পন্নে মাতৃদেবি নমোস্তুতে।।

বৎসরান্তে পিতৃপক্ষ আসে, ভারতবাসী পিতৃপুরুষের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, ঋষি এবং যাদের জল পিণ্ড দেবার কেউ নেই, তর্পণের মাধ্যমে জল দিয়ে তাঁদের আত্মাকেও তৃপ্ত করেন। পিতৃপক্ষ পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার এক প্রকৃষ্ট সময়। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরু। বাঙ্গালি হিন্দুর মহাপর্ব দুর্গাপূজার সূচনা।

ফঃ ৬

বাঁকুড়া শহরে গোপীনাথপুর দত্ত বাড়ির প্রাচীন দুর্গাপূজা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন দুর্গাপূজাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া শহরের গোপীনাথপুরে দত্ত বাড়ির দুর্গাপূজা অন্যতম। প্রথমে দত্ত বাড়ির পারিবারিক পূজাটি বাঁকুড়া জেলার মানকানালী গ্রামে আরম্ভ হয়। মানকানালী গ্রামের পাশ দিয়ে গন্ধেশ্বরী নদী প্রবাহিত। কথিত, এই গন্ধেশ্বরী নদীতে দত্ত বংশেরই জনৈক স্নান করতে গিয়ে একটি খড়্গ পান। সেই রাতেই তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, 'আমি তোর বাড়িতে গন্ধেশ্বরী রূপে এসেছি। তোরা আমার পূজা-অর্চনা কর।' এই সূত্র থেকেই মানকানালী গ্রামে দত্ত বংশে দুর্গাপূজা শুরু হয়।

বাংলা ১১৭৬ সাল, ইংরেজি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ, ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় দত্ত বংশের স্বপ্নাদিষ্ট পারিবারিক পূজাটি গুরুর নির্দেশে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত দ্বারকা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। দ্বারকা গ্রামে বেশ কিছু বছর দেবী পূজিত হন। পরে পরিস্থিতি ফিরে এলে পুনরায় মানকানালীতে পূর্বস্থানে পূজিত হন। এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে মানকানালী গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ দত্ত পরিবার বাঁকুড়া শহরের গোপীনাথপুরে চলে আসায় পূজা গোপীনাথপুরে শুরু হয়। গোপীনাথপুরে সেই পূজা ওই বংশের দামোদর দত্ত শুরু করেন। দামোদর দত্তের পুত্র বৃন্দাবন দত্ত এই পূজা পারিবারিক ধারা অনুসারে চালিয়ে যান। পরে তাঁর পুত্র বৃন্দাবন দত্ত এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ভবতারণ দত্ত ও মন্মথ দত্ত পূজাটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে চালিয়ে যান। তাদের উত্তরপুরুষ একই ধারায় আজও এই পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই পূজায় কোনো মৃন্ময়ী প্রতিমা হয় না, কাপড়ের ওপর দেবীমূর্তি অঙ্কিত হয়ে শিবদুর্গার পূজা হয়। পর্দায় পারিবারিক শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী- সরস্বতী এবং কার্তিক-গণেশের পূজা পরিলক্ষিত হয়। এই বংশের যিনি দেবীর খড়্গ স্নান করতে গিয়ে পেয়েছিলেন, সেই খড়্গ দিয়েই বলিকার্য হয়। সপ্তমী-অষ্টমী ও নবমীতে বলিদান হয়। তবে পশুবলি হয় না। শুধুমাত্র আখ ও শসা বলি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ওই খাঁড়াটিতে কোনো শান (ধার) দেওয়া হয় না। পুকুরের পাঁক ও বস্তা দিয়ে ঘষামাজা করলে পূর্বরূপ ফিরে আসে।

পরিবারের সদস্যরা দেবী-গন্ধেশ্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং গভীর অনুরাগ পোষণ করেন। একমাস যাবৎ বিভিন্ন প্রস্তুতি এবং ষষ্ঠীর রাত্রি যে পুত্তলিকাবুদ্ধি থাকে, কলাবধূ স্নান করানোর পর মন্ত্রপূত করে প্রতিমার পাশে অবস্থানের সঙ্গে প্রতিমা বুদ্ধি থাকে না। বিজয়াদশমী পর্যন্ত এক অদ্ভুত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। তিনদিনের নিরবচ্ছিন্ন দেবীর পূজায়, তাঁর আবাহন দেবীজ্ঞানে মানুষের মতো পদ্য-অর্ঘ্য-বস্ত্র-ফলমূল, ধুপ-দীপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেবীর-অর্চনা হয়।

পরিবারের বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী অন্য পরিবার থেকে আগত গৃহবধূ এক অনন্য ভাবের অনুভব করে বা করেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি বা শুনি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা গ্রহণ করি তার অতীতে যে বস্তু তার অনুভবেই ধর্ম সাধনের বনিয়াদ। এই পরিবারটি যেমন অনুভব করে সঙ্গে প্রতিবেশী এবং শহরের মানুষও দীর্ঘ প্রাচীন পূজাটির গৌরবগাথার মধ্য দিয়ে প্রীতি লাভ করে। পূজার রীতি, আঙ্গিক সবই পূজাপদ্ধতি অনুসারে হয়। পূজার মধ্যে বাহ্যিক ভাবনা অতিক্রম করে এর রসাস্বাদন এক অনির্বচনীয় ভাবের ও শক্তির প্রেরণা লাভ করে। এটাই পারিবারিক সূত্র থেকে উঠে এসেছে।

দেবীর রূপবর্ণনায় বলা হয়েছে— 'চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্' সর্বদাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ প্রদায়িণী দেবীকে চিন্তা করবে। পুরাণ ভেদে পাঠান্তর দেখা যায় : 'চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদান'। কালিকাপুরাণে 'সতত' শব্দটির প্রয়োগই বুঝিয়ে দেয়, দেবী-ধ্যান, দেবী-চিন্তন, দেবী মনন আসলে শুধু পূজাকালীন কৃত্য নয়। দেবী-অনুক্ষণ-চিন্তনীয়া। দুর্গার চিন্তন শক্তিকেই দুর্গা করে তোলে। সাধক সাধ্যা মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। সেটিই শক্তি সাধনার মূল লক্ষ্য। □

সোনামুখী পালবাড়ির দুর্গাপূজা

বিজয় ঘোষাল

শরতের মেঘমুক্ত আকাশ আর কাশফুলের মাথা দোলানো দেখলেই মানুষের মন স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পর্ব শারদীয়া দুর্গাপূজা এখন শহর ছাড়িয়ে গ্রামেগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় হয়ে চলেছে। কিন্তু একসময় দুর্গাপূজা হতো বাড়িতে। বিশেষ করে শহর থেকে নগর সবখানেই জমিদারবাড়ি ও বড়োবাড়িতে এই পূজার চল ছিল। প্রাচীনকালের সেই পূজাগুলির মধ্যে অনেক পূজা এখনো হয়ে আসছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, ভেঙে গেছে বড়বাড়ির একান্নবর্তী সংসার। তবু অনেক ক্ষেত্রেই সেইসব বাড়িতে বংশপরম্পরায় বাড়ির আদিপুরুষ প্রবর্তিত পূজা হয়ে চলেছে। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী শহরের পালপাড়ার পালবাড়ির পূজা বর্তমান পুরুষদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন। সেই সময় পূজায় আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল লক্ষ যোজন দূরে। পালবাড়ির পূজাকে ঘিরে বহু অলৌকিক লোককথা আজও পরিবারের সদস্যদের মুখে মুখে ফেরে। পাল বংশের প্রবীণ সদস্য গনু পাল শোনালেন সেইসব প্রাচীন কাহিনি।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এই পূজার প্রচলন করেন বংশের কোনো আদিপুরুষ। সেটাও শুরু করা হয়েছিল কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের আশায়। প্রচলিত প্রবাদ, ওই সময় বংশের অন্যতম এক সদস্যের দুরারোগ্য ব্যাধি হয়। সেই সময় কোনো পাশ করা ডাক্তার ছিল না। তাই রোগ সারাতে ভরসা করতে হতো কবিরাজ বা বৈদ্যর উপরে। সোনামুখীর নামকরা এক কবিরাজকে এনে চিকিৎসা শুরু করানো হয়। কিন্তু বহুদিন ধরে বহু চিকিৎসার পরেও সেই রোগ নিরাময়ের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। এক সময় সেই কবিরাজ নাকি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমার চিকিৎসার রোগী কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তাই তাঁকে বাঁচানোর জন্য এখন ভগবানই ভরসা। এই কথা বলে কবিরাজ পালবাড়ি থেকে বিদায় নেন। তখন বাড়ির লোকেরা পড়ে যান ভীষণ চিন্তায়। তারা ভাবতে থাকেন কোন উপায়ে এই রোগ সারানো যায়। তখনই মা দুর্গাকে স্মরণ করে বাড়ির সদস্যরা বাড়ির উঠোনে শামিয়ানা টাঙিয়ে মা দুর্গার আরাধনা শুরু করেন।

বর্তমানে পূজায় যেমন আলোর বাহার জাঁকজমক থাকে, তখন কিন্তু তেমন কিছুই ছিল না। তবে এই পূজায় নিষ্ঠা ছিল ষোলোআনা। যা এখনো রয়েছে। ওই পূজা করার পরেই নাকি পালবাড়ির সেই সদস্য ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এটাই ছিল পাল বাড়ির পূজার আদিকথা। তারপর থেকে প্রতিবারই বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়ে চলেছে। শামিয়ানা টাঙিয়ে পূজা শুরু হলেও পরবর্তীকালে মাটির মন্দির এবং আরও পরে পাকাপাকিভাবে নাটমন্দির গড়ে ওঠে। গনু পালের কথায়, বাড়ির পূজায় এতোটুকু অনাচার করার উপায় নেই। তাতে দেবী রুষ্ট হন। যেমন রুষ্ট হয়েছিলেন এক সময় দেবীর মূর্তি গড়া মৃৎশিল্পীর উপরে। প্রচলিত কাহিনি বলছে, সেই বছর বাড়ির বরাবরের ওই মৃৎশিল্পীর প্রচুর কাজ পড়েছিল। তাই তিনি জানিয়ে দেন দিনেরবেলা দেবীমূর্তি রং করবে না। রাতে দেবীর অঙ্গরাগ করবেন। বাড়ির সদস্যরা তা করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও মৃৎশিল্পী নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে রাতেই রং করবেন বলে ঠিক করেন। সেইমতো এক রাতে উঁচু টুল নিয়ে তার উপরে উঠে দেবীর গায়ে রঙের প্রলেপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যতবার তিনি রং-তুলি নিয়ে দেবীর গায়ে ছোঁয়ানোর চেষ্টা করেন ততবারই নাকি কেউ ওই টুল ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে থাকে। এর সঙ্গেই তিনি নূপুরের শব্দ শুনতে পান। ওই রাতে এত কিছু হলেও মৃৎশিল্পী মন্দিরে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পাননি। এই ঘটনার পর শিল্পী ভীষণ ভয় পেয়ে রাতে রং করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। আরও একটি কাহিনি রয়েছে। তখন পালেদের অবস্থা নিম্নগামী। আয় বলতে কিছুই নেই। বাড়ির লোকেদেরও সামর্থ্য নেই দুর্গাপূজার বিপুল ভার বহন করার। তখন বাড়ির সদস্যরা আলোচনা করে ঠিক করেন দেবীর সোনার গয়না বন্ধক রেখে পূজার আয়োজন করা হবে। সেইমতো স্থানীয় এক মহাজনের কাছে ৫০ টাকার বিনিময়ে গয়নাগুলি বন্ধক রাখেন। কিন্তু সেই রাতে ওই মহাজন বাড়িতে বিভিন্ন রকমের শব্দ, কখনো শঙ্খধ্বনি বা অন্যান্য শব্দ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন দেবীর গয়না বন্ধক রেখে তিনি খুব অন্যায় করেছেন। ভীতিকর এইসব শব্দের মধ্যে দিয়েই দেবী যেন নির্দেশ দিচ্ছেন ওই গয়না ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। তখনই সেই মহাজন কালবিলম্ব না করে পালেদের দেওয়া ৫০ টাকা পূজার জন্য উৎসর্গ করে দেবীর সব গয়না ফিরিয়ে দেন। পালবাড়ির পূজাকে ঘিরে এমনই বহু কাহিনি রয়েছে। বর্তমানে পালেদের পরিবার ভাগ হয়ে গেলেও বাড়ির পূজায় সবাই এক হয়ে যে যার সাধ্যমত অর্থ দিয়ে এই পূজা করছেন। তবে প্রাচীনকালের মতো এখন পালবাড়ির পূজায় কোনো জাঁকজমক নেই। যা রয়েছে তা হলো পূজার উপচার এবং প্রতিটি নির্ঘণ্টও মেনে নিষ্ঠা ভরে পূজা। যে পূজা দেখে নিজের অজান্তেই মানুষের ভক্তি আর বিশ্বাস জাগ্রত হয়ে ওঠে। □

‘রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি’

বিমল কৃষ্ণ দাস

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভেই ঋষি মার্কণ্ডেয় কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সাতাশটি শ্লোকের অর্গলা স্তোত্র। তিনি বলছেন— শ্রী জগদম্বার প্রীতিসাধনে রচিত এই অর্গলা স্তোত্র পাঠ করার পরেই মহাস্তোত্র (শ্রীশ্রী চণ্ডী) পাঠ করা বিধেয়। চণ্ডীর মূল তিনটি আখ্যায়িকা অংশে আছে মোট ৪৬৪টি শ্লোক— মধুকৈটভ বধ থেকে শুরু করে মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ ও নিশুম্ভ শুম্ভ বধ পর্যন্ত। বাকি বিভিন্ন অংশে দেবীস্তব ইত্যাদি মিলিয়ে সাতশোর কিছু বেশি শ্লোক বর্তমান। প্রশ্ন হলো, এই ২৭টি শ্লোকের মধ্যে এমন কী আছে যার জন্য ঋষি মার্কণ্ডেয় মূল চণ্ডীপাঠের আগে এই অংশটি পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন বা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মূল চণ্ডীর বহু কিছু না জানলেও আমাদের মহালয়ায় আকাশবাণীর ‘মহিষাসুর মর্দিনী’ অনুষ্ঠানের সুবাদে বাণীকণ্ঠ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত কণ্ঠে উচ্চারিত চণ্ডী স্তোত্রের শ্লোকগুলির অতিরিক্ত আমরা পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে সুরে সুরে অর্গলাস্তোত্র সমূহের সঙ্গে সকলে পরিচিত। সমগ্র অর্থ না বুঝতে পারলেও সুরমাধুর্যে কথাগুলি যেন প্রাণবন্ত হয়ে সকলের মনে এক অন্য অনুভূতির সৃষ্টি করে, হয়ে ওঠে আমাদের কাছে যেন এক জাগরণী গান।

‘ওঁ জয়ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতাপ হারিণি।
জয় সর্বগতে দেবী কালরাত্রি নমোঽস্তুতে।।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে।।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে।।
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।

এর পরে ছাব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রতিটি শ্লোকেই দেবীস্তুতির সঙ্গে যাচ্ঞা করা হচ্ছে— ‘রূপং দেহি... দ্বিষো জহি।’ প্রথম দুটি ও শেষের শ্লোকটি-সহ মোট ৩টি শ্লোক বাদ দিলে বাকি ২৪টি শ্লোকে এই একই প্রার্থনা। তার অর্থ এই চাওয়া বস্তুকয়টির গুরুত্ব নিশ্চয়ই অসীম, নতুবা এতবার কেন এই একই প্রার্থনা! কী আছে এর মধ্যে! আপাত দৃষ্টিতে সবাই বলবেন— কী আর আছে! এতো পরিষ্কার সেই চিরন্তন কথা। সেই অনাদিকাল থেকে মানুষের একই অন্তর-বাসনা। —আমায় সুন্দর রূপ দাও, সর্বত্র জয়ী কর, যশ দাও আর আমার শত্রু বিনাশ কর। একেবারে নিজের একান্ত চাওয়া। এখন বিচারের বিষয় হলো রূপ, সৌন্দর্য সবাই চায়। আমি সুন্দর হই, সকলে আমাকে দেখবে— আমাকেই দেখবে; তাইতো মানুষের এত সাজপোশাক, রূপচর্চার আয়োজন। তবে এই প্রবণতা কিন্তু সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেও বর্তমান। কীট-পতঙ্গ, প্রাণী, বৃক্ষলতা সকলেরই নিজের নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের অসীম আগ্রহ। নিজের পরিমণ্ডলে পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা। সৃষ্টিকর্তা তাই সকলের জন্য নানা ব্যবস্থারও ত্রুটি রাখেননি।

কিন্তু তাঁর এই দান বড়ো ক্ষণস্থায়ী। আজ মুগ্ধ-সৌন্দর্য নিয়ে প্রস্ফুটিত ফুল কাল শুকিয়ে যায়। মানুষের রূপও এক সময় বিবর্ণ হতে থাকে। তাহলে ঋষি মার্কণ্ডেয় কেন এমন তুচ্ছ বস্তুর জন্য বার বার প্রার্থনা করেছেন! যার কোনো স্থায়িত্ব নেই তার জন্য আগ্রহ তিনি নিশ্চয়ই করেননি। প্রকৃতপক্ষে ‘আমায় রূপ প্রদান কর’ এর অর্থ দৈহিক রূপ নয়। আমার আত্মরূপ, আমার সত্তাকে রূপায়িত কর, আমার প্রকৃতি, আমার সামর্থ্যকে জানলেই না আমার কর্মপথ নির্ধারিত সম্ভব হবে। যদি আমি ক্ষত্রিয়ই হই তবে তো আমার কাজ, আমার কর্তব্য সকলকে রক্ষা করা। যদি আমার মধ্যে শিল্পীসত্তা বর্তমান থাকে তবে আমার কাজ সৃষ্টির সত্যকে নানা রূপে তুলে ধরা— সকলকে আনন্দিত করা। শক্তি এক সত্তা। তাই এত কর্মবৈচিত্র্য, সংসার চক্রে পূর্ণতা আনার প্রয়াস। মহর্ষি দেবীর কাছে আপন অন্তর-রূপ প্রার্থনা করেছেন। ‘চিদানন্দ রূপ শিবোহম্ শিবোহম্’,— শুধু কথা নয়, শুধু অনুভূতি নয়। নিরাকার নয়, সাকার চাই। বিমূর্ত নয়, মূর্তরূপে পরিগ্রহ করাও। দেহের নয়, দেহের মাঝে যিনি আছেন— তার রূপ প্রদান কর। রবীন্দ্রনাথের কথায়— ‘তোমারি মিলনশয্যা হে মোর রাজন,/ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন/অসীম, বিচিত্র, কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,/দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ।’

জয় দাও— ‘জয়ং দেহি’, জয় দু-রকমের, এক— আমি চাই— তা পাওয়াটা আমার পক্ষে জয়। আবার প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করাও জয়লাভ। এই চাওয়ার মধ্যেও কত মানুষের কতরকম জয়লিপ্সা। ধার্মিক যেমন অধার্মিকের উপরে জয় চায়, তেমনি অসৎ, অপরাধীও তো তার কাজে জয়ের আশা রাখে। আবার আমার তারা কোনো ক্ষতি করেনি কিন্তু তাদের ক্ষতিসাধন করে আমার উদ্দেশ্য লাভে বিজয়ী হলাম,— এমন জয়াগ্রহ কেন! এখানে কাজ করছে আমার প্রবৃত্তি, আমার ঈর্ষা, লোভ, বাসনা। প্রকৃতপক্ষে দেবীর কাছে এদের উপরেই জয়লাভের প্রার্থনা করা হয়েছে। আপ্তজনেরা বলে থাকেন— অপরকে জয় করা সহজ। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ নিজের উপরে জয়লাভ করা। আর এ কাজ যিনি পারেন সেই পুরুষকে বলা হয় জিতেন্দ্রিয়, আত্মজয়ী, জিতাত্মা। ‘যশো দেহি’— যশ এখানে ‘খ্যাতি’ বলে মনে হয় না। বরং ‘কীর্তি’ শব্দ দিয়ে অনেকটা অর্থের কাছাকাছি আসা যেতে পারে। কারণ যশ-লিপ্সা মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অন্যতম হলেও ভারতীয় সনাতনী শিক্ষা, ঐতিহ্য তাকে কখনো শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়নি।

কারণ যশ সাধারণত অহঙ্কারের জন্মদাতা। সেই যশ দেবকুল প্রার্থনা করবেন! তাঁরা আসলে সৎকর্মে, কতর্ব্যকর্মে নিয়োজিত কর্মে কীর্তিমান হওয়ার প্রার্থনা করেছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ‘তুমি যদি ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে তুমি পাপগ্রস্ত হবে, লোকে চিরকাল তোমার অপযশ করবে, সম্মানিত ব্যক্তির কাছে অপযশ মৃত্যুর চাইতে বেশি।’ —তাই কর্তব্য কর্মে কীর্তি স্থাপনই প্রকৃত যশ। অন্যদিকে বৈষ্ণব সাধনায় ‘যশ’কে বলা হয়েছে সাধনপথের অন্তরায়। কারণ যশ অহঙ্কারেরই নামান্তর। তর্কে বিজয়ী শ্রীজীবের প্রতি রূপ সনাতনের উক্তি ছিল— ‘যশ প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়!’ তাদের যশ বৈরাগ্য ও ত্যাগে। এটি একরকম পরোক্ষ যশ। যাকে বলা যায় একপ্রকার সুকৃতির স্বীকৃতি। অহঙ্কার বর্জিত সুকৃতির যশই অর্গলাস্তোত্রে দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

দ্বিষো জহি— আমার শত্রুনাশ কর। এর অর্থ এই নয় যে আমি যাদের শত্রু ভাবি তাদের সব ধ্বংস করো। স্বার্থের টানাপোড়েনে শত্রুর পরিবর্তন হতে থাকে। হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সবাইকে নাশ করলে একসময় তো কেউ থাকবো না। আসলে যদি এই বাইরের শত্রু নাই থাকে তবে তো ধ্বংসের প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে বাইরের শত্রু তখন সৃষ্টি হবে না। যদি আমার ভেতরের শত্রু সক্রিয় সজীব না থাকে। ভেতরে শান্তি বিরাজ করলে জগৎও শান্তিময় হয়ে উঠবে। আমার ভেতরে যে লোভ, লালসা, ঈর্ষা, হিংসা— যারা নিরন্তর বাইরের শত্রু সৃষ্টি করছে, তাদের বিনাশ হলে তো আর সংঘাতের কোনো প্রয়োজন হবে না! ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবীর কাছে এই শত্রু বিনাশেরই আর্তি জানিয়েছেন। মহাশক্তি সাধনার আগে এ হলো পাত্রটি প্রস্তুত করা। আপন স্বরূপকে চিনতে শেখাও, আমার প্রবৃত্তিকে জয়লাভের শক্তি দাও, কর্মচেতনা জাগ্রত করে কীর্তিমান কর, আর অন্তরে ঠাঁই পাওয়া ষড়রিপুর বিনাশ কর। পরিচ্ছন্ন উপযুক্ত পাত্র না হলে কি মূল্যবান পবিত্র সামগ্রী রাখা যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তার জন্যই এই অর্গলাস্তোত্রের অবতারণা। □

মহামায়া : অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান

লক্ষ্মণ চন্দ্র মাইতি

পরমা প্রকৃতি আদ্যা দুর্গা সুরেশ্বরী
মহামায়া মহাকালী তুমি মহামারী।
ত্রিগুণা পরমেশ্বরী তুমি মহালক্ষ্মী
মহাবিদ্যা সরস্বতী তোমারে প্রণমি।।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির তত্ত্ব বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে, প্রাকৃত বস্তুকে বীক্ষণাগারে বিশ্লেষণ করে প্রকৃতির তত্ত্ব ও সৃষ্টির রহস্যকে আবিষ্কার করেছেন এবং মানব কল্যাণে ব্যবহার করেছেন। জড় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার হাজার হাজার বছর আগে মুনি, ঋষি, বেদান্তবিদ, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীরা ধ্যানের মাধ্যমে সৃষ্টির তত্ত্ব ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং মানব জাতি ও সমস্ত জীব জগতের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে দান করেছেন, উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বের কল্যাণ ও সত্যের অনুসন্ধান। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আলোকে মহামায়া চণ্ডীতত্ত্বের বিশ্লেষণের লক্ষ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মহালয়ার উষালগ্নে আমরা মহামায়া চণ্ডীর যে স্তব-গান, বন্দনাগীতি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ, মনন ও উচ্চারণ করি, সেগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, এই স্তোত্রগুলি জীবন বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু আগে প্রকাশ করেছে।

প্রতি বছর সাড়ম্বরে দেবী দুর্গার বোধন হয়ে থাকে। এই দেবী, শাক্তদের কাছে আদ্যাশক্তি মহামায়া, শৈব্যদের কাছে শিবশক্তি, বৈষ্ণবরা যাঁকে বলেছেন— বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া, আবার সাংখ্যদর্শনে যিনি প্রকৃতি স্বরূপা, দেবী ভাগবতে যাঁকে—

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা হবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাহখিলাধারা তুরিয়া যা চ সংস্থিতা।।

তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।। (১/২)

দেবী যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অবিকৃতা ও শিবা, যাঁকে যোগ-ধ্যানে লাভ করা যায়, যিনি বিশ্বধারা ও তুরীয়া রূপে সংস্থিতা এবং যিনি সাত্ত্বিকী শক্তিতে জ্ঞানরূপা মহাসরস্বতী, রাজসী শক্তিতে ক্রিয়ারূপা মহালক্ষ্মী এবং তামসী শক্তিতে ইচ্ছা-স্বরূপা মহাকালী।

এক মহামায়া পরমেশ্বরী পরমা প্রকৃতি ত্রিগুণা রূপে ত্রিবিধাঃ- মহাসরস্বতী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী-ইচ্ছা ক্রিয়ার সমন্বিত রূপে মহামায়ার এই ত্রিগুণের ধারায় প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়ে চলেছে বিশ্বের বিকাশ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এবং মহাসম্প্রসারণ ও মহাসংকোচন।

ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি ব্রহ্মা, স্থিতি শক্তি বিষ্ণু এবং সংহার শক্তি বা লয় শক্তি শিব। তাই দেব-দেবী কোনো মূর্তি নয়, এক একটি শক্তির নাম। বেদান্তে, তন্ত্রে, সেই শক্তি পূজার কথা বলা হয়েছে,— মূর্তি পূজার কথা নয়। সাধক রামপ্রসাদের সংগীতে সেই সত্যের প্রসাদ আস্বাদনীয়—

'মাটির প্রতিমা পূজিস রে তোরা
মাকে তো তোরা পূজিসনে।'

'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে দেবগণ মহামায়াকে 'প্রকৃতি দেবী'—রূপে প্রণাম জানিয়েছেন— নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্।। (৫/৯)

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত সর্বব্যাপী শক্তিকে ঋষিরা যোগধ্যানের মাধ্যমে লাভ করেছেন; মনের নিয়ন্ত্রণ তথা মনঃসংযোগ দ্বারা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা প্রতি বস্তুর অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি নিহিত তার পরিমাপ করেছেন এই সমীকরণের মাধ্যমে—

E (শক্তি) = M (বস্তুর ভর) × C^2 (আলোর গতিবেগের বর্গ)। বিশ্বজতের প্রতিটি পদার্থের মধ্যে যে শক্তি নিত্য বর্তমান তা চণ্ডীতত্ত্বের মধ্যেও পাই— যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। (৫/৩৪) দেবী, যিনি সর্বভূতে (সমস্ত জড় ও জীবে) শক্তি রূপে বিরাজমান।

বিজ্ঞানীগণ পরমাণুকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন কণার গতি ও শক্তি বিন্যাস। আবিষ্কৃত হলো পরমাণু বোমা, যা সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন তথা ফোটন কণার গতিপথে কণাগুলির মধ্যে সংঘাত ঘটালে বেরিয়ে আসে বিশাল ভয়ংকর অতি উচ্চ তাপমাত্রার তাপশক্তি, যে তাপে কঠিন পদার্থ তরলে, তরল পদার্থ বাষ্পীয় পদার্থে নিমেষে রূপান্তরিত হয়। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে সেই অ্যাটম বোমার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আরো বলা হয়েছে—
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা—(৫/৭৩)

দেবী, যিনি সর্বভূতে (জীবে ও জড়ে) মাতৃশক্তি রূপে অবস্থিতা। মাতৃশক্তি হলো প্রজনন শক্তি। জনক বা জননী যিনি জনন করেন। এই জননী শুধু গর্ভধারিণী নয়— তিনি পালন করেন, স্নেহ মায়া মমতা প্রেম দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করেন, জগজ্জননী মা মহাপ্রকৃতি ও আমাদের তাঁর অনন্ত স্তনধারা— আলো, জল, বাতাস, তাপ, ফুল, ফল, ফসল, ওষধি দিয়ে পুষ্ট করেন। রক্ষা করেন। আবার মহাকাশের অন্ধকার মহাযোনিতে মুহূর্তে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হচ্ছে, স্থিতি লাভ করছে, আবার লয় হচ্ছে।

একই জনন ক্রিয়া, সৃষ্টিক্রিয়া চলছে প্রতিটি মৌল, যৌগ ও পরমাণুর মধ্যে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন পরমাণুর মিলন ক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে জল; এভাবে মৌলে যৌগে, রাসায়নিক মিলন ক্রিয়ায় সৃষ্টির অনন্ত কোটি বিকাশ ও প্রকাশ। পরমাণুর গভীরে ইলেকট্রনে ইলেকট্রনে, প্রোটনে প্রোটনে চলছে সৃষ্টির প্রজনন ক্রিয়া। সোডিয়ামের ইলেকট্রনের সঙ্গে ক্লোরিনের ইলেকট্রনের তড়িৎযোজী বন্ধনে সৃষ্টি হচ্ছে খাদ্যলবণ। বেদান্ত বলছে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম',— সব কিছু চৈতন্যময়, প্রাণময়। সবই চৈতন্যের সৃজন লীলা-সৃষ্টির আনন্দ নিকেতনে।

মা যেমন স্নেহ মায়ার আকর্ষণে আমাদের ধরে রাখেন, তেমনই মহামায়ায় আকর্ষণে এই জগৎ সংসার বাঁধা। বিজ্ঞান যাকে বলছে মহাকর্ষ, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে তাকে বলা হয়েছে মহামায়ার আকর্ষণ— প্রতিটি বস্তুতে প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে, বলেই এই মায়ার আকর্ষণ। আমাদের চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিতে এক একটি দেবতা বা শক্তি নিহিত রয়েছে— যার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল। দেবী চণ্ডীর বন্দনা-গীতে আমরা তা পাই। সর্বোপরি, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলে বিশ্বের সবকিছু চিৎশক্তি দ্বারা পরিচালিত। যার ধারে কাছে জড় বিজ্ঞানের গবেষণা আজও পৌঁছতে পারেনি। তবে আশার আলো— বৈজ্ঞানিক ফ্রিটজফ কাপরা তাঁর The Tao of Physics গ্রন্থে লিখেছেন, 'Finally both (Metaphysical and scientific) approaches recognise that consciousness may be an essential aspect of the universe that will have to be included in a future theory of the Physical Phenomena.' 'পরিশেষে (অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানে) উভয় পক্ষই মান্যতা দিচ্ছে— চৈতন্য বা চেতনাকে মহাবিশ্বের অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রকৃতি তত্ত্বের উদ্ঘাটনে স্থান দিতে হতে পারে।'

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্ব আছে, আছে তার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্র নিহিত শক্তি। চৈতন্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার তত্ত্বে এখনো বিজ্ঞান পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু গীতা ও চণ্ডীতে— ক্ষেত্র আছে, আছে সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে শক্তি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্য। চণ্ডীতে মহামায়ার বন্দনা মন্ত্রে—

'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্যা স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।'

মহামায়া যিনি চিৎশক্তি রূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী অবস্থিতা। তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার।

মানবজাতি এগিয়ে চলুক ধ্যান ও জ্ঞানের পথে; বিজ্ঞানের পথে। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের বীক্ষণাগারে চৈতন্যের আলোর দরজা উন্মোচিত হবেই হবে। □

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩২

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবীমাহাত্ম্য, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা